HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৪ : জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

টপিক – ০১ জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব
টপিক ০২: জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ
টপিক ০৩: জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব
টপিক ০৪: জনসংখ্যার ঘনত্ব
টপিক ০৫: বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো-বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগলিক
টপিক ০৬: বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
টপিক ০৭: মানবসম্পদ উন্নয়ন
টপিক ০৮: আত্মকর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থান
টপিক ০৯: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১০: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

ভূমিকা (Introduction): পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে বহুমুখী সমস্যার আবর্তে জনসংখ্যাবিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত হলেও তা কখন ঘটে, নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি এবং সমাজের স্রষ্টা। প্রকৃতি হলো-আলো, পানি, বায়ু, মাটি, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি যাবতীয় উপাদানের সমষ্টি। পক্ষান্তরে সমাজ হলো মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা সাপেক্ষে যাবতীয় বিষয় যেমন-পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিল্প, সম্পদ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি উপাদানের সমষ্টি। সমাজ একটি জটিল সত্তা যা মানুষ ও মানুষের মধ্যে এবং তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এর উদ্ভব হয়েছে।

তাই যেকোনো দেশের জাতীয় আয় উৎপাদনের দুটি মৌলিক উপাদান হলো প্রকৃতি ও জনসংখ্যা। শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যই কোনো দেশে সমৃদ্ধি ডেকে আনে না। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করতে হলে দক্ষ জনশক্তির পর্যাপ্ত যোগান অপরিহার্য।

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

জনসংখ্যা বিষয় অধ্যয়নে একজন জনবিজ্ঞানীর জন্য নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান, ঘটনা এবং চিত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, এ তথ্যগুলো অবশ্যই সমাজে বহুল প্রচলিত। কিন্তু এসব তথ্য নিয়ে পর্যালোচনা
বা গবেষণা হলে তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় না। একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো দেশের জনসমগ্র বা উক্ত এলাকার মানুষের জন্ম, মৃত্যু, বয়স, বিবাহ, লিঙ্গ, পেশা, বর্ণ, স্থানান্তর, কর্মশক্তির হার, জাতীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় পরিসংখ্যানই হলো জনবিজ্ঞানজনিত তথ্য এবং এ তথ্যসমূহ বিন্যস্ত করা বা সাজিয়ে হিসাব করাকেই উক্ত দেশের ঐ সময়ের জনসংখ্যা পরিমাপ (Measurement of Population) বলে। জনগণের বিভিন্ন ঘটনা ও প্রত্যাশা সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যগুলোকে জনবিজ্ঞানজনিত ঘটনা বলা হয়। সপ্তদশ শতকে সর্বপ্রথম জন গ্রান্ট (John Graunt) পরিসংখ্যান তথ্যের মাধ্যমে লন্ডন নগরীর জনসংখ্যার একটি সুশৃঙ্খল হিসাব উপস্থাপন করেন। এ কারণে তাঁকে আধুনিক জনবিজ্ঞানের মূল প্রবক্তা বলা হয়।

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

জনবিজ্ঞানজনিত তথ্যের বিভিন্ন ঘটনা ও উপাদানসমূহ হলো- (i) জীবন্ত শিশুর জন্মগ্রহণ (live birth), (ii) মৃত শিশু জন্ম (Still birth); (iii) ভ্রূণ অবস্থায় মৃত্যু (Foetal death), (iv) নবজাত শিশু মৃত্যু (Neo-Natal Period deaths : জন্মের পরে ৪ মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ), (v) জন্মোত্তর শিশু মৃত্যু (Post Neo-Natal Period death: জন্মের পরে ৪-১২ মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ), (vi) শিশুকাল (Childhood), (vii) প্রাপ্ত বয়স্ক (Adult), (viii) বিবাহ (Marriage) এবং (ix) অভিবাসন (Migration) প্রভৃতি।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি*

জনবিজ্ঞানজনিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে প্রধানত চারটি পদ্ধতি রয়েছে।

(i) জাতীয় আদমশুমারি পদ্ধতি

(ii) জাতীয় নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি

(iii) বিশেষ নমুনা জরিপ

(iv) প্রাক্কলন কৌশল

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

(i) জাতীয় আদমশুমারি পদ্ধতি (National Population Census): কোনো একটি দেশের বা স্থানের জনসংখ্যার পরিমাণ কত তা জানার জন্য আদমশুমারি হলো-উৎকৃষ্ট পন্থা। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান দপ্তরের সংজ্ঞানুযায়ী, আদমশুমারি হলো কোনো নির্দিষ্ট দেশের বা স্থানের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সকল ব্যক্তির আর্থিক ও সামাজিক তথ্যাদির সংগ্রহ, সংকলন এবং প্রকাশনার সামগ্রিক প্রক্রিয়া। এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল কার্যক্রম যার জন্য ব্যাপক পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। শুমারি শুরুর পূর্বেই, শুমারি এলাকা, জনসমষ্টি, প্রশ্নাবলির সময়গত দিক, কাদেরকে গণনা করা হবে, পরিবারের একক নির্ণয়, সবাইকে প্রশ্ন করা হবে কি-না, নাকি কতক প্রশ্ন নমুনা জরিপের আকারে করা হবে, নাকি প্রশ্নমালা পূরণ করে শুমারি দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য সাক্ষাৎকারদানকারীদের নিকট রেখে আসা বা পাঠানো হবে। কী কী বিষয় প্রশ্নমালায় অন্তর্ভুক্ত হবে, কী কী প্রশ্ন ঐচ্ছিক হবে ইত্যাদি স্থির করে নেয়া হয়। শুমারি থেকে প্রাপ্ত তথ্য শ্রেণিবদ্ধকরণ, তথ্য ব্যবহারকারী, গবেষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে তথ্যাদি নিখুঁতভাবে প্রকাশ ও পরিবেশন করতে হয়। বিশ্বের সকল দেশেই দশ বছর সময় ব্যবধানে, কোনো সুবিধাজনক সময়ে শুমারি করা হয়। অনুন্নত, উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশে শুমারি পদ্ধতির মধ্যে কমবেশি পার্থক্য থাকে। জনসংখ্যার পরিমাপে আদমশুমারি পদ্ধতিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

আদমশুমারি গণনার পদ্ধতি চারটি। যথা-

(ক) প্রত্যক্ষ গণনা (Direct enumeration) : এ পদ্ধতিতে অফিসিয়াল গণনাকারিগণ প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ করে, সেগুলোকে প্রাক্ নির্বাচনি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(খ) পরোক্ষ গণনা (Indirect enumeration): এ পদ্ধতিতে গণনা ডাকযোগে গণনাকারী বা সংবাদদাতার কাছে পাঠানো হয়। দাতা প্রয়োজনীয় তথ্য ফরম পূরণ করে ফেরত পাঠান। এ পদ্ধতি ১৯৫৫ সালে জাপানে ব্যবহৃত হয়েছিল কিন্তু তখন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ছিল অনুকূল।

(গ) প্রকৃত গণনা (Real enumeration): এ পদ্ধতির সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়ে যে যেখানে অবস্থানরত সেখানেই গণনা করা হয়।

(ঘ) বৈধ গণনা (Legal enumeration): যখন কোনো লোককে স্বাভাবিক বাসস্থানেই শুধুমাত্র গণনা করা হয়।

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

বাংলাদেশে ২০১১ সালের পর ২০২২ সালে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়।*

আদমশুমারি গণনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো ব্যক্তি দু'বার গণনায় অন্তর্ভুক্ত না হয়। অস্থায়ী, ভাসমান লোকদের পেশা নির্বাচন, তাদের নিকট হতে তথ্য পাওয়া কঠিন। গণনাকারী নিজেও অদক্ষ, অযোগ্য হতে পারে। আবার অশিক্ষিত লোকদের নিকট হতে সঠিক তথ্য পাওয়াও দুষ্কর। শুমারির আওতা, পরিধি নির্ণয়, প্রাপ্ত তথ্যের শ্রেণিবিন্যাসকরণেও ত্রুটি থাকতে পারে। এছাড়া ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, বিরূপ আবহাওয়া, যোগাযোগ সংকট, সম্পদের অপ্রতুলতা, উত্তরদাতার অনীহা-সংকোচ প্রভৃতি বাধা রয়েছে।

(ii) জাতীয় নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি (National Registration Method): জাতীয় নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি বিষয়টি ব্যাপক হারে নিবন্ধন বোঝায়। জন্ম, মৃত্যু, মৃত-জাত শিশু, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিপত্নীক, পৃথকবাস ইত্যাদি ঘটনা নথিবদ্ধকরণের রীতিকে নিবন্ধীকরণ বলা হয়। এসব ঘটনা ব্যক্তির জীবন, মৃত্যুবরণ ও এ দু'য়ের মাঝামাঝি তার সমাজ জীবন এবং মর্যাদা পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত।

নিবন্ধনকরণ সর্বপ্রথম ১৮৩৬ সালে ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছিল। জন্ম নিবন্ধনে ব্যর্থতার জন্য ১৮৭৪ সালে ইংল্যান্ডে জরিমানা বিধান চালু হয় এবং ১৯২৬ সাল থেকে বাধ্যতামূলকভাবে মৃত শিশুর জন্মগ্রহণ নিবন্ধনকরণ প্রথা চালু হয়। ১৭৪৮ সালে সুইডেনে জনসংখ্যার রেকর্ড লিপিবদ্ধ করার আইন পাস হয়। তাই সুইডেন প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানের অগ্রদূত হিসেবে সম্মানের দাবিদার। আমেরিকায় ১৯৪৬ সালে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় স্থাপন করা হয়।

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

(iii) বিশেষ নমুনা জরিপ (Special Sample Survey): জনসংখ্যা সংক্রান্ত ডাটা সংগ্রহের জন্য নমুনা জরিপ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এটি নির্ভর করে আদর্শ জনসংখ্যা হতে নেয়া নমুনা সংগ্রহের ওপর। সাধারণত স্বল্প সংখ্যক দক্ষ স্টাফ কর্তৃক এ পছন্দ করা জরিপ করা হয়। এ তথ্য তালিকা আকারে সাজানো, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা এবং প্রকাশ করা হয়।

এ নমুনা জরিপ খুব দ্রুত এবং কম ব্যয়সম্পন্ন হতে পারে। এক্ষেত্রে যে ত্রুটি থাকতে পারে তা নমুনা যাচাই-এর মাধ্যমে সন্তোষজনকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। বিশ্বে জনসংখ্যা সংক্রান্ত নমুনা জরিপ হিসেবে 'WFS-World Fertility Survey' কে অন্যতম নমুনা জরিপ হিসেবে স্বীকার করা হয়।

(iv) প্রাক্কলন (আনুমানিক) কৌশল (Estimation Technique) : এ পদ্ধতিতে কোনো অঞ্চলের জনসংখ্যা সম্পর্কে যা কিছু যৎসামান্য তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোকে ব্যবহার করে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্যকোনো অঞ্চলের জনসংখ্যা বৈশিষ্ট্যাদির জ্ঞান প্রয়োগ বা প্রক্ষেপ করা হয়। এতে অনেক ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ থাকলেও যেকোনো প্রকার তথ্যের অনুপস্থিতিতে অন্তত এ ধরনের অনুমিত তথ্যের আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গবেষক কিছুটা নির্ভরযোগ্যতার সাথে ফলাফল নির্ণয় করতে পারে।

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

প্রজনন ও মৃত্যুসংখ্যা পরিমাপ

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট পরিমাণ জনসংখ্যার সাথে প্রজননহার ধারণাটি সম্পর্কিত। এ হার নিবন্ধীকরণ, শুমারি এবং সাধারণ জরিপ যেকোনো তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই পরিমাপ করা হয়।

পক্ষান্তরে মৃত্যুসংখ্যা হলো পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক ক্ষয়শক্তি। ইহা জনসংখ্যার কাঠামোর পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তনের বড় শক্তি হিসেবে কাজ করে।

প্রজনন ও মৃত্যুসংখ্যা পরিমাপের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো স্থূল জন্ম (প্রজনন) হার ও স্থূল মৃত্যুহার পদ্ধতি এক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

প্রজনন ও মৃত্যুসংখ্যা পরিমাপ

(ক) অশোধিত বা স্থূল জন্ম (প্রজনন) হার (Crude Birth Rate-CBR)

জন্মহারের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে অশোধিত বা স্থূল জন্মহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Barclay এ প্রসঙ্গে বলেন, 'কোনো নির্দিষ্ট সময়ে তালিকাভুক্ত জীবিত মোট জন্মসংখ্যা ও ঐ নির্দিষ্ট সময়ের (সাধারণত এক বছর) মধ্যবর্তী সময়ের মোট জনসংখ্যার অনুপাতকে ১০০০ দ্বারা গুণ করলে স্থূল বা অশোধিত জন্মহার পাওয়া যায়।' (The Crude Birth Rate is a ratio of total registered live birth to the total population, also in some specific year, also multiplied by 1000.')

সূত্র :

$$\text{স্থূল জন্মহার CBR} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে মোট জীবিত জন্মসংখ্যা}}{\text{নির্দিষ্ট বছরের মধ্যসময়ের মোট জনসংখ্যা}} \times 1000$$

$$= \frac{\sum B}{\sum P} \times 1000$$

এখানে, $\sum B$ = নির্দিষ্ট বছরে মোট জীবিত জন্মসংখ্যা

$\sum P$ = নির্দিষ্ট বছরের মধ্যসময়ের মোট জনসংখ্যা

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

প্রজনন ও মৃত্যুসংখ্যা পরিমাপ

উদাহরণ : মনে করি, ২০২২ সালে বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ ৭৭ হাজার জীবিত শিশু জন্ম লাভ করে এবং উক্ত বছরের মধ্যসময়ে মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি হলে ঐ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (জন্মহার) প্রতি হাজারে হবে—

$$\text{স্থূল জন্মহার, CBR} = \frac{৩০,৭৭,০০০}{১৭,০০,০০০,০০} \times ১০০০ \text{ জন} = ১৮.১$$

জন্মহার হলো কোনো দেশের জনসংখ্যা পরিবর্তনের মাপকাঠি। এ হার ধনাত্মক হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ঋণাত্মক হলে জনসংখ্যা হ্রাস পায়।

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

প্রজনন ও মৃত্যুসংখ্যা পরিমাপ

সমালোচনা/সীমাবদ্ধতা

স্থূল বা অশোধিত জন্মহার বের করা সহজ এবং পর্যাপ্ত ব্যবহার থাকলেও নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সমালোচনা রয়েছে। যেমন:

(i) থমসন-লুইস এর মতে, এটি কোনো অর্থবহ ব্যাখ্যা প্রদান করে না। কারণ বিভিন্ন বছরে জন্মহার বিভিন্ন হয় কেন এবং একই সময়ে বিভিন্ন জনসংখ্যার মধ্যে কোনো তুলনামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করে না।

(ii) দেশের সকল লোকের প্রজনন ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু এ হার মোট জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়, যা সঠিক নয়। সত্যিকার অর্থে প্রজননহার বের করতে হলে ১৫-৪৯ বয়স কাঠামোর প্রজনন ক্ষমতার কথা চিন্তা করাই শ্রেয়। কারণ ১৫ বছরের নিচে শিশু ও ৪৯ বছরের ওপরে বয়স্ক লোকের প্রজনন ক্ষমতা নেই। তাই শিশু ও বয়স্কদের এক্ষেত্রে বাদ দেয়া উচিত। বাংলাদেশে স্থূল জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে), ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী ১৯.৪ জন।

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

প্রজনন ও মৃত্যুসংখ্যা পরিমাপ

(খ) অশোধিত বা স্থূল মৃত্যুহার (Crude Death Rate-CDR)*

কোনো জনসমষ্টিতে প্রতি বছর প্রতি হাজারে মোট যত লোক মৃত্যুবরণ করে তাকে অশোধিত বা স্থূল মৃত্যুহার বলে। David-M-Heer বলেন, 'অশোধিত মৃত্যুহার হলো নির্দিষ্ট বছরে মধ্যসময়ে কোনো জনসমষ্টির সাথে প্রতি হাজারে মৃত্যুসংখ্যার অনুপাত।' (Crude death rate is the ratio of the number of deaths which occur within a given population during as specified year to the size of death population at the mid-year.) Thompson এবং Lewis এর মতে, 'এ হার প্রকৃতপক্ষে অশোধিত জন্মহারের মত গণনা করা হয়।' যদিও বিভিন্ন বয়স অথবা বয়সদলে মৃত্যুহার একরকম হয় না, তথাপি এ পরিমাপে বয়সগত তারতম্যকে উপেক্ষা করা হয়।

সূত্র :

$$\text{স্থূল মৃত্যুহার CDR} = \frac{\sum D}{\sum P} \times 1000$$

এখানে, $\sum D$ = নির্দিষ্ট বছরে মোট মৃত্যুসংখ্যা

$\sum P$ = ঐ নির্দিষ্ট বছরের মধ্যসময়ে মোট জনসংখ্যা

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

প্রজনন ও মৃত্যুসংখ্যা পরিমাপ

সাধারণভাবে, মৃত্যুহার নির্ণয়ে ইহা অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি হলেও বছরের শুরু ও শেষের মৃত্যুহার এবং আকস্মিক ঘটনার হার নির্দেশ করতে পারে না। এটি বছরের মধ্যসময়ের মৃত্যুহার নির্দেশ করতে পারে। স্থূল মৃত্যুহার একটি দেশের জনগণের আয়, শিক্ষা, পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্য সচেতনতা, নিরাপদ খাদ্য (Food Safety), ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশের স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে), ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী ৬.১ জন।

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

প্রজনন ও মৃত্যুসংখ্যা পরিমাপ

উদাহরণ: মনে করি, ২০১৬ সালে বাংলাদেশে ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করলো এবং উক্ত বছরের মধ্যসময়ে মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি হলে ঐ বছরে প্রতি হাজারে মৃত্যুহার হবে-

$$\text{স্থূল মৃত্যুহার, CDR} = \frac{৮,৬৭,০০০}{১৭,০০,০০০,০০} \times ১০০০ \text{ জন} = ৫.১ \text{ জন।}$$

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

প্রজনন ও মৃত্যুসংখ্যা পরিমাপ

স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (Normal Growth Rate-NGR)

কোনো দেশের জনসংখ্যার প্রতি হাজারে বা স্থূল জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্যকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার বলে। কোনো নির্দিষ্ট বছরের এ হার নির্ণয় করা গেলেও সাধারণত এটি গতীয় অর্থে অর্থাৎ, কয়েক বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গরা বোঝাতে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ধারণাটি ব্যবহৃত হয়। একে শতকরা হার হিসেবে দেখানো হয়।

$$NGR = \frac{\text{জন্মহার} - \text{মৃত্যুহার}}{১০০০} \times ১০০$$

উদাহরণ : মনে করি, ২০২২ সালে বাংলাদেশে স্থূল জন্মহার ১৮.১ ও স্থূল মৃত্যুহার ৫.১ হলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার হলো–

$$NGR = \frac{১৮.১ - ৫.১}{১০০০} \times ১০০ \text{ জন} = ১.৩$$

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

প্রজনন ও মৃত্যুসংখ্যা পরিমাপ

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার (Population Growth Rate-PGR)

শুধুমাত্র কোনো দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্য দ্বারাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয় না। কারণ উক্ত দেশের অনেক মানুষ যেমন বিদেশে যেতে পারে আবার অপরাপর দেশ হতেও অনেক মানুষ উক্ত দেশে আসতে পারে। তাই জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার নির্ণয়ে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারের সাথে বহিরাগমন ও বহির্গমন বা দেশান্তরের হার বিয়োগ করে যে হার পাওয়া যায়, তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। যেমন-

$$PGR = \frac{(\text{জন্মহার} + \text{বহিরাগমন হার}) - (\text{মৃত্যুহার} + \text{বহির্গমন হার})}{১০০০} \times ১০০$$

উদাহরণ : মনে করি, ২০২২ সালে বাংলাদেশে জন্মহার ১৮.১ ও মৃত্যুহার ৫.১ এবং বহিরাগমন হার ২ ও বহির্গমন হার ৩ হলে—

$$\text{জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, (PGR)} = \frac{(১৮.১ + ২) - (৫.১ + ৩)}{১০০০} \times ১০০ \text{ জন} = ১.২ \text{ জন}$$

এছাড়া, শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Zero Population Growth-ZPG) ধারণাটিও জনসংখ্যার একটি নির্ধারক। এটি স্থূল জন্মহার (CBR) ও স্থূল মৃত্যুহারের (CDR) পার্থক্য হতে সৃষ্টি যার মান শূন্য। যেমন: ZPG = CBR – CDR = 0 কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য হলে বলা যায় উক্ত দেশের জনসংখ্যা স্থিতাবস্থায় রয়েছে।

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

প্রজনন ও মৃত্যুসংখ্যা পরিমাপ

World Population Prospects–2019 অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব 1253 জন।

দেশ/অঞ্চলের নাম	প্রতি বর্গ কি. মি.-এ জনসংখ্যার ঘনত্ব
১. ইউরোপীয়ান নগর রাষ্ট্র : মনাকো (Monaco)	২৬,১৫০ (৬৭,৭২৮/ প্রতি বর্গ মাইল)
২. চীনের অঞ্চল, ম্যাকাউ (Macau)	২১,৪২০
৩. সিঙ্গাপুর	৮,৩৫৮ (২১,৬৪৬ / প্রতি মাইল^2)
৪. হংকং (চীন)$_{২০১৭}$	৬,৬৫৯ (১৭,৩১১ / প্রতি মাইল^2)
৫. জিব্রাল্টার (Gibraltar)	৩,৩৬৯ (৮,৭২৬ / প্রতি মাইল^2)

Ref UN (World Population Prospects–2019) World Bank

এছাড়াও বিশাল আকৃতির দেশ কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা হলো যথাক্রমে ৪ জন ও ৩ জন। পৃথিবীর সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হলো মঙ্গোলিয়া। সাধারণত কোনো স্থানের ভূ-প্রকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া ও জলবায়ু, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রথা, প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি কাজের সুবিধা, শিল্পায়ন, যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি বিষয়ের ওপর জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৪ : জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

টপিক – ০২ জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

কোনো স্থান বা দেশের জনসংখ্যা অনেকগুলো উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। যেমন: জন্মহার, মৃত্যুহার, নিট অভিবাসন (Net Migration) হার প্রভৃতি। সুতরাং যেসব উপাদানের ওপর কোনো স্থানের জনসংখ্যা নির্ভরশীল, ঐ সকল উপাদানকে জনসংখ্যার নির্ধারক বলে। অথবা, যেসব উপাদান বা বিষয়সমূহ কোনো দেশের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে সেগুলোকে জনসংখ্যার নির্ধারক বলে। জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেশটির অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। প্রত্যেক দেশের জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ সমান নয়। তারপরও বলা যায় যে, কোনো দেশের জনসংখ্যা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন-

১. জন্মহার: জন্মহার বলতে নির্দিষ্ট বছরে কোনো দেশে প্রতি হাজারে মোট জীবিত জন্মসংখ্যাকে নির্দেশ করে। অথবা ১৫-৪৯ বয়স দলের সন্তান ধারণক্ষম প্রতি হাজার মহিলার একটি বছরে মোট জীবিত জন্মসংখ্যাকে নির্দেশ করে। সাধারণত দেখা যায় দরিদ্র দেশে জনসংখ্যার জন্মহার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উন্নত দেশ অপেক্ষা অধিক। কারণ উন্নত দেশের জনগণ উচ্চ জীবনযাত্রার মান ভোগ করে, তারা সকলেই প্রায় কর্মে নিয়োজিত। দরিদ্র দেশে বেকারত্বের হার অধিক, উচ্চ জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে তারা অবগত নয়। এ কারণে দরিদ্র দেশে জন্মহার উচ্চ থাকে।

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৭ এবং ২০২৪ সালের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২.১৭এবং ১.৩৩। স্থূল জন্মহার একই সময়ে যথাক্রমে ২৫.৬ এবং ১৯.৪ জন (প্রতি ১০০০ জনে)।

World Development Report 2014 অনুযায়ী কয়েকটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেয়া হলো:

দেশের নাম (দরিদ্র/উন্নয়নশীল দেশ)	%, জনসংখ্যা বৃদ্ধি	দেশের নাম (উন্নত দেশ)	%, জনসংখ্যা বৃদ্ধি
বাংলাদেশ	১.৩	যুক্তরাষ্ট্র	০.৯
ভারত	১.৪	যুক্তরাজ্য	০.৬
পাকিস্তান	১.৮	জাপান	০.০
নাইজার	৩.৭	সুইডেন	০.৬
সিয়েরালিওন	৩.১	অস্ট্রেলিয়া	১.৪
লাইবেরিয়া	৩.১	কানাডা	১.০

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

২. মৃত্যুহার: মৃত্যুহারও জনসংখ্যার একটি নির্ধারক। মৃত্যুসংখ্যা মূলত গড়পড়তাভাবে জনশক্তি হ্রাস বা জনসংখ্যা হ্রাসকে বোঝানো হয়। নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে প্রতি হাজার মানুষের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা দ্বারা মৃত্যুহার পরিমাপ করা হয়। দরিদ্র দেশে শারীরিক দুর্বলতা, রোগব্যাধি (কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, গুটি বসন্ত, নিউমোনিয়া ইত্যাদি), দুর্ঘটনা প্রভৃতি কারণে মৃত্যুহার অধিক। জন্মমুহূর্তে আঘাত (birth injury), নাড়ী কাটার সময় রোগ সংক্রামক, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি কারণে জন্মের সময় অনেক শিশু মারা যায়।

$$\text{স্থূল মৃত্যুহার, CDR} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরের মোট মৃত্যুসংখ্যা } (\sum D)}{\text{বিবেচ্য বছরের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা } (\sum P)} \times 1000$$

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

নিম্নের সারণিতে বিশ্ব জনসংখ্যা তথ্য থেকে বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের স্থূল জন্মহার (CBR) ও স্থূল মৃত্যুহার (CDR) দেখানো হলো :

অঞ্চল	১৯৮০		১৯৯০	
	CBR	CDR	CBR	CDR
সমগ্র পৃথিবী	৩১.৫	১২.৮	২৭	১০
অধিক উন্নত দেশসমূহ	২১.০	১১.৪	১৫	৯
আফ্রিকা	৪৬.৩	১৯.৮	৪৪	১৫
এশিয়া	৩৪.৯	১৩.৬	২৭	৯
উত্তর আমেরিকা	১৬.৫	৯.৩	১৬	৯
ইউরোপ	১৬.১	১৩	১৩	১০

উৎস : World Population data sheet : 1980, 1990, 1992

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৭ ও ২০২৪ অনুযায়ী বাংলাদেশে স্থূল মৃত্যুহার যথাক্রমে ৮.১ এবং ৬.১ (প্রতি হাজারে)।

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

৩. নিট অভিবাসন" (Net Migration-NM): নিরাপদ ও উন্নত জীবনের সন্ধানে মানুষ প্রতিনিয়ত ছুটে চলছে এক স্থান হতে অন্যস্থানে, এক দেশ হতে অন্য দেশে। অভিবাসন বলতে কোনো ব্যক্তি স্থায়ী বা অস্থায়িভাবে বসবাসের লক্ষ্যে এক স্থান বা এক দেশ থেকে অন্য স্থান বা অন্যদেশে গমনকে নির্দেশ করে। এটি মূলত এক বা একাধিক ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তনের গতিশীল প্রক্রিয়া বোঝায়। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা দেশে বহিরাগমন (In-migration) এবং বহির্গমন (Out-migration) এর পার্থক্যকে Net Migration বা নিট অভিবাসন বলে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো একটি দেশের মোট অভিবাসী জনসংখ্যা এবং মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার মধ্যকার পার্থক্যকে ঐ দেশের নিট অভিবাসন (Net Migration) বলা হয়। নিট অভিবাসন, N = I-O; এখানে 1 = In-migration বা অভিবাসীর সংখ্যা এবং O = Out migration বা দেশান্তরের সংখ্যা। Nm > 0 হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, Nm <0 হলে জনসংখ্যা হ্রাস পায় এবং N = 0 হলে জনসংখ্যা স্থির থাকে। উন্নত ও নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা যে. দেশে সবচেয়ে অধিক সেদেশের ধনাত্মক নিট অভিবাসন অধিক হবে। আবার কোনো দেশের প্রতি এক হাজার জন নিট জনসংখ্যায় এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধিকে নিট অভিবাসন হার (NMR) বলে।

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

$$\text{সুতরাং নিট অভিবাসন হার (NMR)} = \frac{\text{অভিবাসীর সংখ্যা} - \text{দেশান্তরের সংখ্যা}}{\text{মোট জনসংখ্যা}} \times 1000$$

এক্ষেত্রে অভিবাসীর তুলনায় দেশান্তরের সংখ্যা বেশি হলে নিট অভিবাসন হার ঋণাত্মক হয়। যেমন—

বাংলাদেশে ২০২২ সালের মধ্যসময়ে মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি। উক্ত বছরে বাংলাদেশে বহিরাগমন ৯৫,০০০ জন এবং বহির্গমন ৫,৩৭,৬৭৫ জন।

$$\text{সুতরাং নিট অভিবাসন হার (NMR)} = \frac{৯৫,০০০ - ৫,৩৭,৬৭৫}{১৭,০০,০০০০০} \times ১০০০ = -২.৬০৩$$

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

World Development Report 2012 অনুযায়ী নিম্নের সারণিতে নিট অভিবাসন (প্রতি হাজারে) দেখানো হলো :

দেশ	নিট অভিবাসন	দেশ	নিট অভিবাসন*
যুক্তরাষ্ট্র	৫০৫২	বাংলাদেশ	– ৫৭০
যুক্তরাজ্য	৯৪৮	ভারত	– ১০০০
জাপান	১৫০	পাকিস্তান	– ১৪১৬
কানাডা	১০৫০	সোমালিয়া	– ২৫০
সুইডেন	১৫০	মিয়ানমার	– ৫০০
নরওয়ে	১৩৫	পেরু	– ৬২৫

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

উপরিউক্ত সারণি হতে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্র হলো বিশ্বে অভিবাসীদের দেশ। সে দেশে সামাজিক নিরাপত্তা, কর্ম প্রাপ্তির সুযোগ, উন্নত জীবনের সম্ভাবনা ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ-এর তুলনায় অনেক বেশি এমনকি জাপান, নরওয়ে, কানাডা অপেক্ষাও অধিক।

সাধারণত শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈবাহিক সম্পর্ক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অবস্থা, বৈষম্যমূলক, আচরণ, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নিট অভিবাসনের এ পরিবর্তন ঘটে।

অভিবাসন** গন্তব্যের শীর্ষে ৬ দেশ হলো-১. যুক্তরাষ্ট্র, ২. জার্মানি, ৩. সৌদি আরব, ৪. রাশিয়া, ৫. যুক্তরাজ্য এবং ৬. সংযুক্ত আরব আমিরাত। ২০২৩ সালের তথ্যানুসারে যেসব দেশে সবচেয়ে বেশি নতুন মিলিয়নিয়ার হতে যাচ্ছেন, সেগুলো হলো : (১ম) অস্ট্রেলিয়া, (২য়) সংযুক্ত আরব আমিরাত, (৩য়) সিঙ্গাপুর, (৪র্থ) যুক্তরাষ্ট্র, (৫ম) সুইজারল্যান্ড, (৬ষ্ঠ) কানাডা।

অভিবাসন লক্ষ্যে দেশত্যাগে শীর্ষ ৬ দেশ হলো-১. ভারত, ২. মেক্সিকো, ৩. চীন, ৪. রাশিয়া, ৫. সিরিয়ান আরব রিপাবলিক এবং ৬. বাংলাদেশ।

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

৪. ভূ-প্রকৃতি: ভূ-প্রকৃতি জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা বিচ্ছিন্ন দ্বীপাঞ্চল বা মরু অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠিন। তাই সেখানে জনবসতি বিরল বা কম। পক্ষান্তরে উর্বর সমতলে জনবসতি অধিক, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি।

৫. জলবায়ু : যেকোনো দেশের জলবায়ু জনসংখ্যা পরিবর্তনের জন্য একটি মৌলিক নির্ধারক হিসেবে বিবেচিত। লক্ষ্য করা যায়, সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জনগণের প্রজনন ক্ষমতা বেশি, অল্প বয়সে সন্তান ধারণক্ষমে পরিণত হয়। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের জনগণের অবস্থা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তুলনায় কম।

৬. সমাজব্যবস্থা : সমাজব্যবস্থা কৃষিনির্ভর হলে পরিবারে পুত্র সন্তানের চাহিদা বেশি। এ কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সমাজব্যবস্থা শিল্পনির্ভর হলে বৃহৎ পরিবারের ধারণা ভেঙ্গে যায়। পুরুষ-মহিলা সবাই কাজ করলে উক্ত সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়।

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

৭. উপযুক্ত শিক্ষার প্রসার: সমাজে উপযুক্ত শিক্ষার প্রসার না হলে মানুষের মধ্যে উপযুক্ত পরিবার, দক্ষ মানবসম্পদ ধারণাগুলো জাগ্রত হবে না। জন্ম নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব তারা বুঝতে পারবে না। দরিদ্র দেশে এরূপ অবস্থায় জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

৮. কুসংস্কার: ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসে ভূমিকা রাখে। যেমন- কোনো সমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহসহ বিভিন্ন কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস জনসংখ্যার পরিবর্তনে খুবই গুরুত্ব বহন করে।

৯. দারিদ্র্য: দারিদ্র্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দরিদ্র লোকদের আনন্দ-ফুর্তির একমাত্র বিষয় হলো যৌনজীবন, ফলে তাদের সন্তান উৎপাদন বেশি হয়।

১০. বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ: দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। বাল্যবিবাহের ফলে সমগ্র জীবনে সন্তান উৎপাদন বেশি হয়। বহুবিবাহ-বহুস্ত্রী থাকলে তাদেরও সন্তান সংখ্যা বেশি হয়। আর যে সমাজে বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহ থাকবে না, সেখানে জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হবে।

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

১১. জীবনযাত্রার মান: পৃথিবীর যেসব দেশে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত সেসব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম। যেসব দেশে জনগণের জীবনযাত্রার মান নিম্ন সেসব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক। অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক বিপরীত।

১২. খাদ্যে শ্বেতসারের আধিক্য খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্বেতসারের আধিক্য থাকলে প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, জনসংখ্যা বাড়ে। পক্ষান্তরে আমিষ জাতীয় খাবার গ্রহণের হার অধিক হলে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য তালিকায় শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অধিক।

১৩. চিত্তবিনোদনের সুযোগ: বাংলাদেশের জনগণের চিত্তবিনোদনের কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। এখানে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়াকেই চিত্তবিনোদন হিসেবে মনে করে। এর ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। খেলাধুলা, ক্লাব-পাঠাগার, আনন্দ ভ্রমণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের চিত্তবিনোদনের সুযোগ থাকলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়।

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

১৪.বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা: বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তায় পুত্র সন্তানের আশায় অনেক পরিবারে জনসংখ্যা বেড়ে যায়।

১৫. নারী উন্নয়ন: সমাজে নারীদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন করা হলে তাদের কর্মসংস্থানের পথ সুগম হবে। নারীর এরূপ ক্ষমতায়ন যত অধিক হবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তত হ্রাস পাবে। নারীরা যদি শুধু ঘরে আবদ্ধ থাকে, তখন সন্তান উৎপাদনই একমাত্র কর্তব্য মনে করে।

১৬. জন্ম-মৃত্যু হার: জন্মহার অধিক, মৃত্যুহার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বিপরীত অবস্থায় জনসংখ্যা হ্রাস পায়।

১৭. আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি: দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের গড় আয়ুষ্কালও বৃদ্ধি পায়। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে নারীদের গড় আয়ু ছিল ৫৫.৩ বছর, পুরুষদের ৫৪.৫ বছর। ২০২৩ সালে গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৭২.৩, নারীদের ৭৩.৮ এবং পুরুষের ৭০.৮ হয়েছে।উপরিউক্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়, গড় আয়ু বৃদ্ধির পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে নবজাতক ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস।

১৮. উন্নত জীবন প্রত্যাশা: যেসব দেশে জনগণের উন্নত জীবন প্রত্যাশা প্রবল এবং সে ধরনের সকল সুযোগ বর্তমান থাকে, সেসব দেশে জনসংখ্যার নিট অভিবাসন অধিক হয়, জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৪ : জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

টপিক – ০৩ জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

বিদ্যমান সীমিত ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব দেশভেদে দু প্রকার হতে পারে। যেসব দেশ বা অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও স্বল্প সেসব স্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যই প্রত্যাশিত। উক্ত দেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি, পণ্যের চাহিদা ও বাজার সম্প্রসারণ, মানবসম্পদ উন্নয়নের দ্বারা মূলধনের বিকল্প উপকরণ হিসেবে উৎপাদনে নিয়োগ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। সম্পদবহুল দেশগুলোতে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে শ্রমবিভাগ প্রবর্তনের দ্বারা বৃহদায়তনশিল্প স্থাপন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আবার যেসব দেশ বা অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি, সেসব স্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি উন্নয়নকে ব্যাহত করে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হলো':

বাংলাদেশ জনাধিক্যের চাপে জর্জরিত। এদেশের আয়তন মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। কিন্তু লোকসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে আমাদের এ বিপুল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ জীবনধারণের বিভিন্ন মৌল উপাদান থেকে বঞ্চিত রয়েছে। অধ্যাপক হারভে লাইবেনস্টেন-এর মতে, অতিরিক্ত জনসংখ্যা আয় বিনষ্টকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে। অনুন্নত দেশগুলো অনুন্নত অবস্থায় পড়ে থাকে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

জনাধিক্যজনিত চাপের ফলে বাংলাদেশে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. খাদ্য সমস্যা: জনাধিক্যের কারণে বর্তমানে প্রতি বছর গড়ে ৩০ লক্ষ মে. টন খাদ্য ঘাটতি পড়ে। কারণ, বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২২% কিন্তু খাদ্য উৎপাদনে বিশেষত শস্য উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ০.৮৮%**। তাই খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। ফলে লেনদেন ভারসাম্যে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে।

সারণি : খাদ্যশস্য উৎপাদন ও আমদানি (লক্ষ মেট্রিক টন)

বছর	খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন (ধান, গম, ভুট্টা)	সার্বিক খাদ্যশস্য আমদানি (সরকারি ও বেসরকারি খাত)
১৯৯৫–৯৬	১৯০.৬	৫১.২৪ ২০১৯–২০ এ লক্ষ্যমাত্রা
২০২৩–২৪ (লক্ষ্যমাত্রা)	৫১৩.৪৫	২০২৩–২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুসারে সার্বিকভাবে দেশে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ৩৭.৪৯ লক্ষ মে. টন (চাল ০০ ও গম ৩৭.৪৯ লক্ষ মে. টন)

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশ স্বাভাবিকভাবেই খাদ্য আমদানিনির্ভর দেশ। কিন্তু বিশ্ববাজারে খাদ্যসামগ্রীর আকাশছোঁয়া দাম বৃদ্ধিতে খাদ্য সমস্যা বাংলাদেশে ক্রমাগতভাবে তীব্রতর হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডমিনিক স্ট্রাউস-কান উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, খাদ্যসামগ্রীর দাম এভাবে বাড়তে থাকলে পরিণতি হবে ভয়াবহ। মারাত্মক সামাজিক অস্থিরতা দেখা দিবে। এমনকি পরিস্থিতি যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াতে পারে। তিনি বলেন, খাদ্যের উচ্চমূল্যের কারণে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধাজনিত মৃত্যুর মুখে পড়বে। শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগবে। বেঁচে থাকাই তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। খাদ্য মজুদের ক্ষেত্রে গত পাঁচ থেকে দশ বছরে যতটুকু উন্নয়ন হয়েছিল, এ সংকটে তা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

২০১৯-২০ অর্থবছর বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস-এর কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় খাদ্যপণ্যের দাম যখন ঊর্ধ্বগামী, তখন বাংলাদেশের অনেক অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট-এর মাধ্যমে এদেশে খাদ্যপণ্যের দাম অনেক বৃদ্ধি করেছে। এতে জনদুর্ভোগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের এরূপ কার্যক্রম এখনও অব্যাহত রয়েছে। জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে এরূপ সমস্যাও ক্রমেই অধিক সৃষ্টি হবে। সরকার খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, দামস্তর সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং সরকারের খাদ্য মজুদ বৃদ্ধি, দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য রেশনিংসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

২. বস্ত্র সমস্যা: মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহের মধ্যে গুরুত্বানুসারে অন্নের পরেই বস্ত্রের স্থান। লজ্জা নিবারণ, মার্জিত, সুশৃঙ্খল ও সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনের জন্য বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ তুলা উৎপাদনকারী দেশ নয় বলে বস্ত্রে আমরা কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। প্রতি বছর আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে তুলা ও কাপড় বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়। এছাড়া শীত বস্ত্রের অভাবে প্রতি বছর অনেক ছিন্নমূল মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনুকূল পরিবেশ, সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যের শ্রমিক এবং বিস্তৃত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার থাকা সত্ত্বেও তুলা উৎপাদনে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। তাই বস্ত্রশিল্পের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে সুতা আমদানি করতে হয়।

বিদেশ হতে বস্ত্রশিল্পের জন্য সুতা আমদানি বাবদ বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে। যেমন :

বছর	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
২০০৪–০৫	৩৯৩
২০২০–২১	২৪৩৬
২০২১–২২	৫২৪৫
২০২২–২৩	২৭৯৫

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা জনাধিক্যের কারণে বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। আমাদের জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে আমাদের সীমিত সম্পদের সাহায্যে এ বিপুল জনগোষ্ঠীর সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

তবে সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ব্যাপক সহায়তা প্রদান করছে। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ও এডিবির পরামর্শ এবং অর্থ সাহায্যও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এতসত্ত্বেও অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে চার দশকেও এখাতে আমরা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন করতে পারিনি।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

৪. চিকিৎসা সমস্যা: সুস্থ ও সবল জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য শর্ত। পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ, উপযুক্ত বাসস্থান, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার মৌল উপাদান যা বাংলাদেশে সহজলভ্য নয়। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি হাসপাতালের স্বল্পতা, চিকিৎসা সরঞ্জামাদির অভাব, ওষুধের উচ্চমূল্য, ডাক্তারের অভাব, নার্সের অভাব প্রভৃতি সমস্যাকে প্রকট করে তুলেছে। এছাড়া বর্তমানে শহরকেন্দ্রিক ব্যয়বহুল চিকিৎসা সুবিধা আমাদের অধিকাংশ লোকের নাগালের বাইরে। এদেশে শিশু মৃত্যুর হারও অধিক, তাই মা-বাবা বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার আশায় অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে।

সুতরাং বলা যায়, চিকিৎসার অভাবে আমাদের রোগাক্রান্ত ও নির্জীব জনগোষ্ঠী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

নিম্নে সারণিতে বাংলাদেশের ডাক্তারপ্রতি জনসংখ্যা দেখানো হলো :

বছর	১৯৯৬	২০০০	২০১১	২০১৮
ডাক্তার	৪৯৫৫	৪২১৮	২৮৬০	১৭২৪

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

৫. বাসস্থানের সমস্যা: বাসস্থান মানুষের একটি অন্যতম মৌলিক চাহিদা। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য আবাসিক চাহিদা বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রায় ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাছাড়া বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতি বছর নতুন বাসস্থান নির্মাণের প্রয়োজনে কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। বাসস্থানের অভাবে এদেশের বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল মানুষ রেল লাইন, রাস্তা ও ড্রেনের পাশে যত্রতত্র কুঁড়েঘর তুলে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এ ধরনের চিত্র দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব: জীবনধারণের জন্য কর্মসংস্থানের একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে জনাধিক্যের চাপ কর্মসংস্থানের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। কারণ, আমাদের দেশে যে দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না। ফলে দেশে বেকারত্ব, অর্ধবেকারত্ব, ছদ্মবেশী বেকারত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করছে। শিল্পায়নের ধীরগতি এবং সেবাখাতের সীমিত উন্নয়নের ফলে এদেশের কৃষিবহির্ভূত খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগও খুবই সীমিত। ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে বাংলাদেশে বেকার সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। এ বিপুল বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা তখন একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

৭. পরিবেশের ওপর প্রভাব: সুস্থ, সবল জাতিগঠনে পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে যে হারে চলছে তা যদি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না হয় তাহলে পরিবেশগত মহাবিপর্যয় দেখা দিবে। জনাধিক্যের কারণে বসতবাড়ি নির্মাণের জন্য কৃষিজমি ও বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে। জ্বালানি হিসেবেও বনজ সম্পদ বিনাশ হচ্ছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতেও ধনাত্মক ভূমিকা রাখছে। অপরিকল্পিত জীবন-যাপন সুস্থ সমাজ বিনির্মাণের পথে অন্তরায়। সমাজে নানা অস্থিরতা, অরাজকতা, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, বেকারত্ব, দরিদ্রতা, নানারূপ উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা জনাধিক্যের ফলে উদ্ভব হচ্ছে। অর্থাৎ অতিরিক্ত জনসংখ্যা দ্বারা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

৮. মূলধন গঠন: বাংলাদেশে বিদ্যমান সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক এবং আয়ের তুলনায় ভোগ প্রবণতা অধিক বিধায় জনগণের সঞ্চয় ক্ষমতা কম। তাই এদেশে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন গঠন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৯. মাথাপিছু আয় হ্রাস: জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মাথাপিছু আয় হ্রাস পায়।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

১০. জীবনযাত্রার মান বর্তমানে বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে দারিদ্র্যের উর্ধ্বসীমা (%) ১৮.৭ ও নিম্নসীমা (%) ৫.৬ শতাংশ অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয় জনগণের জীবনযাত্রার মানকে প্রত্যাশিত মানে পৌঁছাতে পারেনি।

১১. বাণিজ্য ঘাটতি: ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সামগ্রিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রতি বছর খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা, নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য আমদানি করতে হয়। সে তুলনায় বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির পরিমাণ কম। তাই বাংলাদেশ প্রতি বছরই বাণিজ্য ঘাটতির সম্মুখীন হয়।

১২. প্রশাসনিক সমস্যা: অতিরিক্ত জনসংখ্যা নানা প্রকার প্রশাসনিক সমস্যা তৈরি করে। রাজনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নানানভাবে অনিয়ম, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা, আইন বিরোধী কর্মকাণ্ড দেখা দেয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় সুশাসনের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

১৩. ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে বাজেট প্রণয়নে সমস্যা তৈরি হয়। সরকার খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে প্রায় ঘাটতি বাজেট অনুসরণ করতে হয়। এছাড়া সরকারের উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নও হুমকির মুখে পড়ে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়।

১৪. পুষ্টিহীনতা: জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির কারণে এদেশের জনগণ প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য ও উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। এরূপ অবস্থা বিদ্যমান থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মেধাহীন ও দুর্বল হয়ে পড়বে।

১৫. কৃষি উৎপাদন হ্রাস: জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমাদের সীমিত ভূমির ওপর ক্রমশ চাপ বাড়ছে। এর ফলে কৃষিভূমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, কৃষিভূমিগুলো খণ্ড-বিখণ্ড ও বিচ্ছিন্ন হয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

১৬. শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত: অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশ। খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা, প্রয়োজনীয়, অতিপ্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য আমদানিতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। তাই শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করা সম্ভব হচ্ছে না।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

১৭. বৈদেশিক নির্ভরশীলতা: বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভোগ্যপণ্য আমদানি ও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ক্রমশ বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর হয়ে পড়ছে। এরূপ সাহায্য অধিকাংশই কঠিন শর্তযুক্ত হওয়ায় তা আমাদের উন্নয়নের প্রতিকূলে কাজ করে।

১৮. মুদ্রাস্ফীতি: ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব না হওয়ায় যোগান সংকট সৃষ্টি হয়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিচ্ছে। এ কারণে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পায়।

১৯. মানবসম্পদ উন্নয়নে বাধা: সম্পদের তুলনায় অধিক জনসংখ্যার কারণে বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সামাজিক খাতে কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে প্রত্যাশিত পরিমাণে মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব

২০. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা: অতিরিক্ত জনসংখ্যা যেকোনো দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে। জন-অসন্তোষ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ক্ষমতা দখল ইত্যাদি কারণে জনমনে অশান্তি বিরাজ করে।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, জনাধিক্য সমস্যা বাংলাদেশের জন্য এক ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা থেকে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়ে আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। অর্থাৎ সম্পদের তুলনায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা বর্তমানে আমাদের দেশের জন্য এক দুর্বিষহ বোঝা বা আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য সকল সমস্যার

সাথে তুলনা করলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যাই বাংলাদেশের জন্য প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এছাড়া জনসংখ্যাকে ভবিষ্যৎ চাহিদার আলোকে প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব হলে এটি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৪ : জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

টপিক – ০৪ জনসংখ্যার ঘনত্ব

জনসংখ্যার ঘনত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জনসংখ্যার ঘনত্ব

জনসংখ্যা তত্ত্বের ইতিহাস খুব প্রাচীন। মানবসভ্যতার প্রায় সকল মহৎ চিন্তাবিদই জনসংখ্যা বিষয়ে কিছু না কিছু 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ জল্পনা' করেছেন। তাঁদের মধ্যে Confucius, Plato, Aristotle, Givanni Botero, Ibna-Khaldun প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।। ম্যালথাস তত্ত্বের পূর্বে ইংল্যান্ডের Robert Wallace, William Godwin, ফ্রান্সের Marquis de-condorcet এবং ম্যালথাস পরবর্তী ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, সমাজসংস্কারক M. T. Sadler, T. Doubelday, Herbert Spencer, Corrado Gini, Henry George, Karl-Marx, Car-Saunders, W. S Thomson প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য যেমন-বর্তমান জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, তার ফলাফল, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ যে তত্ত্বে আলোচিত হয়, তাকে জনসংখ্যা তত্ত্ব বলা হয়। কোনো দেশের শ্রমের যোগান সাধারণত জনসংখ্যা ও শ্রমের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শ্রমশক্তির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আবার এ শ্রমশক্তি জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে। তাই যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমের যোগান তথা জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য 'জনসংখ্যার তত্ত্বসমূহ পাঠ করা প্রয়োজন। জনসংখ্যা বিষয়ক দুটি তত্ত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো:

তত্ত্ব দুটি হলো: (ক) ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ও (খ) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

উৎস: অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৭৯৮ সালে, নীতিবাগীশ, সুপণ্ডিত ধর্মযাজক, ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ থমাস রবার্ট ম্যালথাস (Rev. Thomas Robert Malthus) "জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক" বিষয়ক যে বক্তব্য "An Essay on the Principies of Population ..." নামক গ্রন্থে প্রচার করেন, এটি ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত। এ তত্ত্বকে- 'জনসংখ্যার জৈবিক ও সামাজিক তত্ত্ব' বা 'Natural and Social Theories of Population.' হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

মূল বক্তব্য: ম্যালথাসের তত্ত্বের মূলভিত্তি ছিল জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং জীবনধারণের উপকরণ খাদ্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে। ('By nature human food increases in a slow arithmetical ratio, but man himself increases in a quick geometrical progression'-Malthus)

এক্ষেত্রে, জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো জনসংখ্যা বাড়ে ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪ ইত্যাদি হারে এবং খাদ্য বাড়ে, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি হারে। তিনি মনে করেন, আর্থিক সামর্থ্যের চেয়ে জনসংখ্যা বেশি হলে মানুষের উন্নতি ও সুখ হবে না। সীমিত সম্পদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা অর্থনৈতিক সুখকে নস্যাৎ করে দেয়।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

অনুমিত শর্ত: ম্যালথাসের তত্ত্ব বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত অনুমিত শর্ত গ্রহণ করা হয় :

(১) জীবনধারণের উপকরণ তথা খাদ্যের যোগান সীমিত।

(২) নর-নারীর মধ্যে আকর্ষণ প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রিত ও শাশ্বত।

(৩) কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধি প্রযোজ্য।

(৪) একমাত্র উৎপাদনব্যবস্থা হলো কৃষি।

(৫) জমি ও উৎপাদনক্ষমতা অপরিবর্তিত।

(৬) উৎপাদন প্রযুক্তি অপরিবর্তিত।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

তত্ত্বের বিশ্লেষণ : ম্যালথাস ২৫ বছর সময়কে একক হিসেবে ধরে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ২৫ বছর অন্তর যে হারে পরিবর্তিত হয় তাকে নিম্নের সূচির সাহায্যে দেখানো যায় :

বছর	০	২৫	৫০	৭৫	১০০	...	২০০	...	৩০০
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১	২	৪	৮	১৬	...	২৫৬	...	৪০৯৬
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি	১	২	৩	৪	৫	...	৯	...	১৩

জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির উপরিউক্ত সম্পর্ক থেকে বোঝা যায়, ১০০ বছরে খাদ্য বাড়বে ৫ গুণ কিন্তু জনসংখ্যা বাড়বে ১৬ গুণ, একইভাবে তিন শতাব্দী পরে খাদ্য বাড়বে ১৩ গুণ কিন্তু জনসংখ্যা বাড়বে ৪০৯৬ গুণ এবং দু' হাজার বছর পরে এ দুয়ের ব্যবধান হবে অপরিমেয়।

ম্যালথাস 'Poor Laws'-এ মন্তব্য করেন, গরিবদের কষ্টের ভার লাঘব করার প্রচেষ্টা পৃথিবীকে নিকৃষ্টতর মানুষে ভরে দিবে, খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য সরবরাহে অপ্রতুলতা দেখা দিবে, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাবে। ফলে সে তার অজ্ঞাতসারে নিজের ও পরিবারের দুঃখ-কষ্টের সাথে দেশের অন্যদেরও দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করবে। তাঁর মতে, ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ও ক্ষুধার্ত মুখ। 'এ যেন কুকুরের লেজ ধরার খেলা। মুখ যতটা লেজের কাছে যায়, লেজও ততখানি সরে যায়।'

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

লেখচিত্র :

জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে সূচিতে উল্লিখিত সম্পর্কটি নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো :

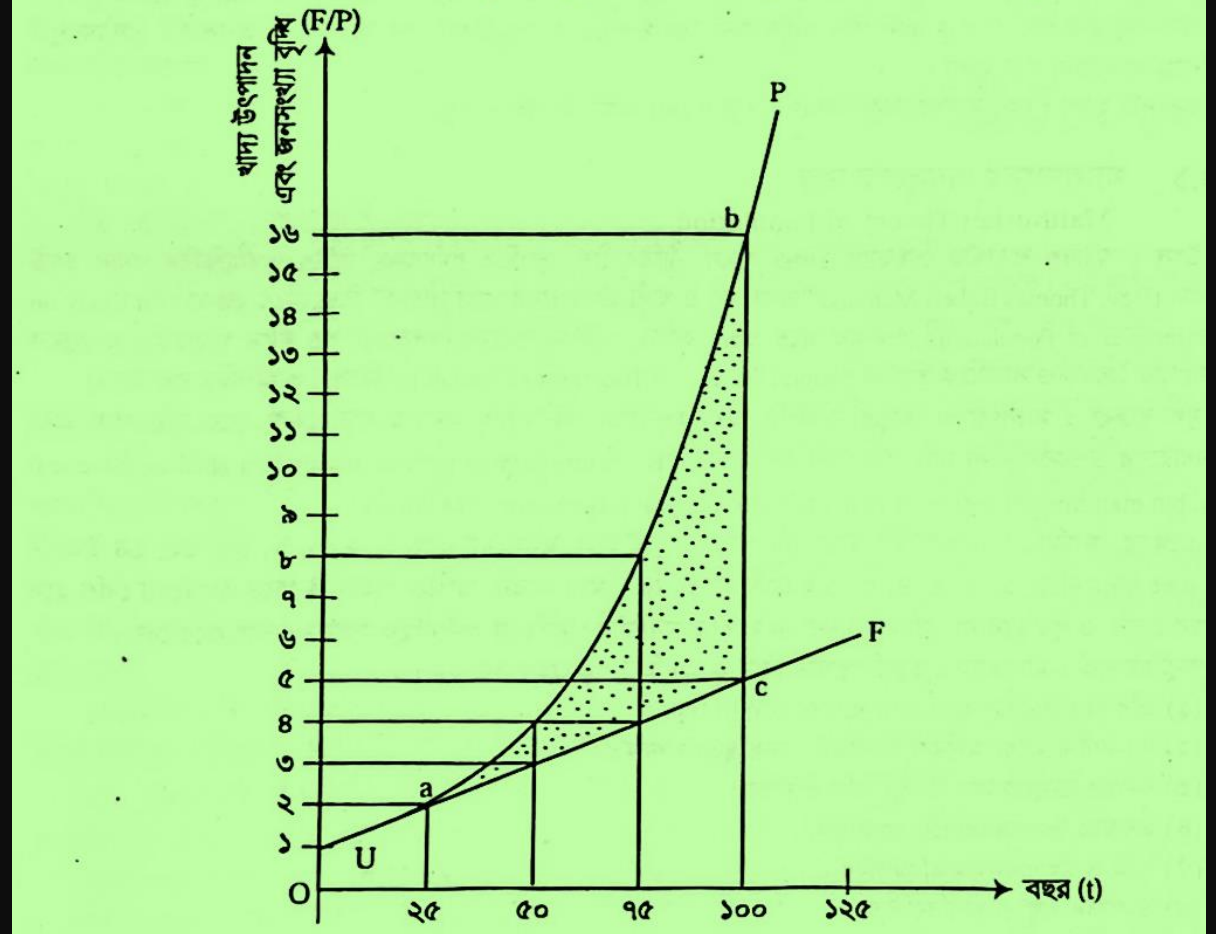

চিত্র ৪.১ : খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে প্রতি ২৫ বছর সময়কে একক হিসেবে ধরা হয় এবং লম্ব অক্ষে খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়। প্রতি ২৫ বছর অন্তর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে তথা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ...। এভাবে প্রাপ্ত বিন্দুসমূহের সমন্বয়ে খাদ্য রেখা পাওয়া যায় UF। সূচি থেকে প্রাপ্ত প্রতি একক সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাপ দ্বারা জনসংখ্যা রেখা পাওয়া যায় UP.

চিত্র থেকে লক্ষ্য করা যায়, ২৫ বছর সময়ের পর খাদ্য বৃদ্ধির হার অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক হয়। ১০০ বছর সময়ের মধ্যে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় abc পরিমাণ।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

বিকল্প ব্যাখ্যা :

ম্যালথাসের উল্লিখিত জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের সম্পর্কটি প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে নিম্নে বারচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

লেখচিত্র :

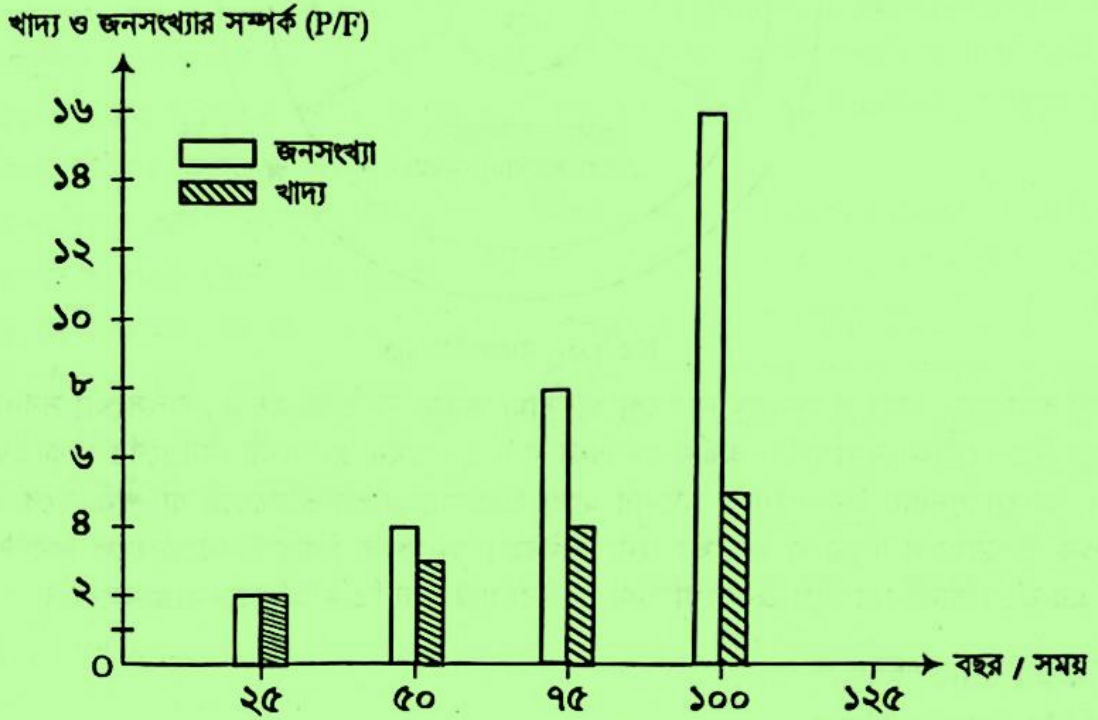

চিত্র ৪.২ : খাদ্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্কের বারচিত্র

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে সময় ও লম্ব অক্ষে খাদ্য ও জনসংখ্যার সম্পর্ক দেখানো হয়। চিত্র থেকে বোঝা যায়, ২৫ বছর সময়ে খাদ্য ও জনসংখ্যার সম্পর্ক সমান থাকলেও ৫০, ৭৫, ১০০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিক হয়। এভাবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে জনসংখ্যা ও খাদ্যের মধ্যে অভারসাম্য দেখা দেয় এবং প্রকৃতিতে নানারূপ বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ম্যালথাসের প্রতিরোধব্যবস্থা

ম্যালথাস তাঁর তত্ত্বে দু'ধরনের প্রতিরোধকব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। যথা: (i) নিবারণমূলক বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Preventive check) ও (ii) প্রাকৃতিক নিরোধ বা বাস্তব রোধনব্যবস্থা (Positive check).

(i) নিবারণমূলকব্যবস্থা: নিবারণব্যবস্থাকে ম্যালথাস নৈতিক বাধা, পাপ ও লাঞ্ছনার মধ্যে বিভক্ত করেছেন। নৈতিক বাধা বলতে তিনি কোনো প্রকার অনিয়ম-অনাচার ব্যতিরেকে বিবাহ থেকে বিরত থাকা, পাপ বলতে নর-নারীর অবৈধ সম্পর্ক, অস্বাভাবিক অনুরাগ, বিবাহ শয্যার পবিত্রতা লঙ্ঘন, লাঞ্ছনা বলতে যুদ্ধ বিগ্রহ, বাড়াবাড়ি ইত্যাদিকে বোঝান। তিনি মানুষের নৈতিক গুণাবলি উন্নত করার মাধ্যমে, সুবিবেকসম্পন্ন এবং সচ্চরিত্রবান আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ার প্রতি ইঙ্গিত করেন।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

ii) প্রাকৃতিক নিরোধ: প্রাকৃতিক নিরোধ বলতে অসম্পূর্ণ পেশাগত নিযুক্তি, কঠোর শ্রম, চরম দরিদ্রতা, শিশুদের অযত্ন প্রতিপালন, জটিল রোগ, মহামারী', সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ইত্যাদিকে বোঝান। ম্যালথাসীয় চক্র (Malthusian cycle)-এর সাহায্যে খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা সংক্ষেপে দেখানো হলো:

চিত্র ৪.৩ : ম্যালথাসীয় চক্র

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

চক্রে লক্ষ্য করা যায়, খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জনসংখ্যা সর্বদাই খাদ্য যোগানকে ছাড়িয়ে যাওয়ার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। অর্থাৎ জনাধিক্য ঘটেছে। তখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়গুলো কাজ করতে থাকে। এভাবে পুনরায় জনসংখ্যা ও খাদ্যের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা স্থায়ী হবে না। ম্যালথাস মনে করেন, প্রাকৃতিক উপায়গুলো নিষ্ঠুর ও মানুষের জন্য দুঃখবহ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নিবারণমূলকব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে সাফল্যের সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

ম্যালথাপের তত্ত্বের সমালোচনা

Criticism of Malthusian Theory

ম্যালথাসবাদ-এর জনসংখ্যা তত্ত্বটি এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী তত্ত্ব হলেও পরবর্তীকালে তা নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। তাঁর তত্ত্বের দুর্বল দিকগুলো নিম্নরূপ:

১. জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ে না: ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের ভোগ-বিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তথা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যায়। বর্তমানে অনেক উন্নত দেশেই লোকসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ছে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধির কার্যকারিতার ওপর ভিত্তি করে ম্যালথাস ব্যক্ত

করেন যে, খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। বাস্তবে জৈব রাসায়নিক সার ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, উন্নত প্রথায় চাষ, উন্নত বীজ, সেচ, পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি দ্বারা একই জমিতে খাদ্য উৎপাদন কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এর ফলে খাদ্য উৎপাদনের গাণিতিক হার ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

৩. শিল্পবিপ্লব ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন: ব্রিটেনে সংঘটিত শিল্পবিপ্লব এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে উন্নত দেশগুলোতে উৎপাদনের পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে। এরূপ প্রযুক্তিগত বিপ্লবের যাদুকরী প্রভাব সম্পর্কে ম্যালথাস মোটেও অবহিত ছিলেন না।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

৪. জনসংখ্যার গুণগত দিক উপেক্ষিত: ম্যালথাসের তত্ত্বে জনসংখ্যার কেবল সংখ্যাগত দিকটি বিবেচনা করা হয়েছে, গুণগত দিক উপেক্ষিত হয়েছে। মানুষ শুধু ক্ষুধার্ত মুখ ও পেট নিয়েই জন্মগ্রহণ করে না, কর্মঠ হাত ও বিদ্যা বুদ্ধির সাহায্যে যথেষ্ট উপার্জনের পথও প্রশস্ত করে।

৫. সম্পদের ন্যায্য বণ্টন: বর্তমানকালে সম্পদ বণ্টনের সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা হতেও প্রবলতর। সেলিগম্যানের মতে, "জনসংখ্যা শুধু সংখ্যাগত সমস্যা নয় বরং এটি সম্পদের দক্ষ উৎপাদন ও ন্যায্য বণ্টনেরও সমস্যা।" (The problem of population is not one of mere size, but of efficient production and equitable distribution.)

৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সহযোগিতা: আংশিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কোনো দেশকে খাদ্য ঘাটতির এলাকা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে পৃথিবীর খাদ্য উদ্বৃত্ত এলাকা হতে খাদ্য ঘাটতি এলাকায় তা সরবরাহ করা সম্ভব।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

৭. চিত্তবিনোদন ও উন্নত শিক্ষার কারণে জন্মহার হ্রাস: শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে দেশ উন্নত হলে এবং চিত্তবিনোদনের সুযোগ ও জীবনকে উপভোগ করার বাসনা প্রভৃতির ফলে জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধির কোনো সুযোগ থাকে না।

T. R. Malthus বহু বিতর্কিত, বহু প্রশংসিত নাম। তাঁকে কখনো আমরা হিমালয়ের চূড়ায় তুলেছি, আবার কখনো টেনে নামিয়েছি অতি সাধারণ স্তরে। তবে খুব একটা দূরে বেশি দিন তাঁকে সরিয়ে রাখতে পারিনি। ম্যালথাসের তত্ত্বের অনেক সমালোচনা থাকলেও এ তত্ত্বের গুরুত্ব বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশে বিদ্যমান। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের ফলে উন্নত দেশে তাঁর তত্ত্ব ব্যর্থ হলেও দরিদ্র দেশগুলোকে জনসংখ্যার পরিমাণ সম্পর্কে সচেতন করছে এবং খাদ্য ও প্রচলিত শক্তির উৎস যে সসীম সে সম্বন্ধে আমাদেরকে সজাগ করছে। অর্থনীতিবিদ P.A. Samuelson যথার্থই বলেন, "... ভারত, চীন এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্যের কথাটি যখন ভাবা হয়, তখন এ তত্ত্বের মধ্যে সত্যের যে বীজ নিহিত আছে, তা প্রমাণিত হয়।"

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

ম্যালথাসের সমালোচকেরা তাঁকে 'মিথ্যা ভবিষ্যৎ বক্তা' (False Prophet) বলে অভিহিত করলেও, বাংলাদেশের মতো দেশগুলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বিকল্প খাদ্য ও শক্তির উৎস সন্ধানে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে ঋণী। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্যের চরম সংকট, উচ্চমূল্য, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে, এ তত্ত্ব ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে সচেতন করবে নিশ্চিত বলা যায়। সুতরাং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে তাঁর তত্ত্বের প্রয়োগশীলতা লক্ষ্য করা যায়। দু শত বছর পরে উন্নত দেশসমূহেও এ তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে নতুন করে গবেষণার ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

কাম্য জনসংখ্যা

কাম্য জনসংখ্যা এমন একটি জনসংখ্যার স্তর নির্দেশ করে যেখানে উৎপাদন এবং আয় সর্বাধিক হয়। অর্থাৎ যে জনসংখ্যায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

কাম্য জনসংখ্যার কথা প্লেটো এবং বটেরো কয়েকশ বছর পূর্বে বললেও বর্তমান শতাব্দীতে জুলিয়াস উলফ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাম্য জনসংখ্যার বিশ্লেষণ করেন। কোনো স্থানের জনসংখ্যা কম (Under population) বা বেশি (Over population) হতে পারে। কাম্য জনসংখ্যা হলো কম অথবা বেশি জনসংখ্যার ত্রুটিমুক্ত মাঝারি একটি অবস্থা।

K. E. Boulding-এর মতে, যে জনসংখ্যার দ্বারা জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে, তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

অধ্যাপক ডাল্টনের মতে, কাম্য জনসংখ্যা হলো তা, যা মাথাপিছু আয়কে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত করে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

কাম্য জনসংখ্যা

কাম্য জনসংখ্যার পরিমাপ : অধ্যাপক ড. ডাল্টন কাম্য জনসংখ্যা পরিমাপের জন্য নিম্নে উল্লিখিত সূত্রটি প্রদান করেন :

$$M = \frac{A - O}{O}$$

এক্ষেত্রে, M = অসামঞ্জস্যের পরিমাণ (Maladjustment)

A = প্রকৃত জনসংখ্যা (Actual Population)

O = কাম্য জনসংখ্যা (Optimum Population)

M এর মান ধনাত্মক (+ve) হলে অধিক জনসংখ্যা, ঋণাত্মক (–ve) হলে নিম্ন জনসংখ্যা এবং শূন্য (0) হলে কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশ করে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

কাম্য জনসংখ্যা

উৎপত্তি: কাম্য জনসংখ্যা সম্পর্কে অধ্যাপক Edward West এবং Henry Sidgwickসহ অনেক অর্থনীতিবিদ ধারণা প্রদান করলেও 'লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্'-এর অধ্যাপক এডউইন ক্যানন (Prof. Edwin Cannan) কর্তৃক ১৯২৪ সালে প্রকাশিত "Wealth" নামক গ্রন্থে কাম্য জনসংখ্যা ধারণা তত্ত্বাকারে উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে এ ধারণা রবিনসন্স (Robinsons), ডাল্টন (Dalton) এবং কার সানডারস (Carr Saunders) কর্তৃক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯২৩ সালে "The Population Problem: A study in Evolution." গ্রন্থে Carr Saunders-এর বক্তব্যটি অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে বিধায় কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বলতে কার সানডারস-এর তত্ত্বকে বোঝায়।

মূলকথা : কাম্য জনসংখ্যা বলতে মাথাপিছু সর্বোচ্চ আয় স্তরের জনসংখ্যাকে বোঝায়। অর্থাৎ কাম্য জনসংখ্যা বলতে জনসংখ্যার এমন একটি স্তর বোঝায়, যেখানে নির্দিষ্ট উৎপাদনব্যবস্থা সাপেক্ষে সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় অর্জিত হয়। দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা যদি কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম বা বেশি হয় তাহলে উৎপাদনের পরিমাণ ও মাথাপিছু আয় সর্বাধিক অপেক্ষা কম হবে। এ তত্ত্ব অনুসারে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জনসংখ্যা থাকা প্রয়োজন। এ নির্দিষ্ট পরিমাণ জনসংখ্যাকেই কাম্য জনসংখ্যা বলা হয়।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

অনুমিত শর্তসমূহ :

(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সময়, মোট জনসংখ্যা ও কর্মক্ষম জনসংখ্যার অনুপাত স্থির।

(২) কর্মক্ষম জনসংখ্যার মাথাপিছু উৎপাদন ঘণ্টা স্থির।

(৩) নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে-

(i) প্রাকৃতিক সম্পদ স্থির,

(ii) কারিগরি কৌশল স্থির ও

(iii) মূলধনের পরিমাণ স্থির।

(৪) দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বর্তমান।

(৫) উন্নত জ্ঞান, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা এবং

(৬) পর্যাপ্ত জনশক্তির কর্মোদ্যম।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

কাম্য জনসংখ্যা সম্পর্কে অভিমত: অধ্যাপক রবিনসনের মতে, যেখানে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উৎপন্ন বা প্রতিদান সৃষ্টি হয়, সে স্তরের জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যা বলা হয়। অধ্যাপক হিকস্-এর মতে, কাম্য জনসংখ্যা ঐ স্তরকে নির্দেশ করে, যেখানে মাথাপিছু উৎপাদন সর্বোচ্চ হয়। Carr-Saunders বলেন, যে জনসংখ্যার স্তরে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক কল্যাণ পাওয়া যায়, সে স্তরের জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যা বলা হয়। অধ্যাপক 'রবিন্স' এর মতে, "সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উৎপন্ন বা প্রতিদান সৃষ্টিকারী জনসংখ্যার স্তরকে কাম জনসংখ্যা বলে।" কে. ই. বোল্ডিং অনুরূপ বলেন, "যে জনসংখ্যায় জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ হয়, তাই কাম্য জনসংখ্যা।"

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলফ্রেড সারভে (Alfred Servey) তাঁর "The General Theory of Population' গ্রন্থে কাম্য জনসংখ্যা সম্পর্কে বলেন, যে স্তরে মাথাপিছু প্রান্তিক উৎপাদন সর্বোচ্চ সে স্তরের জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যা বলা হয়।

অতএব, উপরিউক্ত অভিমত পর্যালোচনা করে বলা যায়, যে স্তরে সর্বোচ্চ মাথাপিছু উৎপাদন, সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক কল্যাণ, সর্বোচ্চ উৎপাদন ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয়, সে স্তরের জনসংখ্যাকে কোনো দেশের কাম্য জনসংখ্যা বলা হয়।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

তত্ত্বের বিশ্লেষণ: মনে করি, বাংলাদেশে কাম্য জনসংখ্যা হলো ৪ কোটি এবং বর্তমান জনসংখ্যা হলো ১৪ কোটি। এক্ষেত্রে কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ের ডাল্টন-এর সূত্রের সাহায্যে পাই, M = (A

$$M = \frac{A - O}{O}$$

এখানে, M = অসামঞ্জস্যের পরিমাণ, O = কাম্য জনসংখ্যা এবং A = প্রকৃত জনসংখ্যা

$$\therefore \quad M = \frac{১৪ - ৪}{৪} = \frac{১০}{৪} = ২.৫$$

আমরা জানি, M এর মান যত বড় হবে জনসংখ্যার অসামঞ্জস্য তত বেশি হবে বলা যায়। এ মান ধনাত্মক হলে অধিক জনসংখ্যা এবং ঋণাত্মক হলে নিম্ন জনসংখ্যা এবং শূন্য হলে কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশ করে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

K. E. Boulding-এর কাম্য জনসংখ্যার ধারণাকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Alfred Survey তাঁর 'The General Theory of Population' গ্রন্থে নিম্নের প্রায় অনুরূপ চিত্রের দ্বারা প্রকাশ করেন :

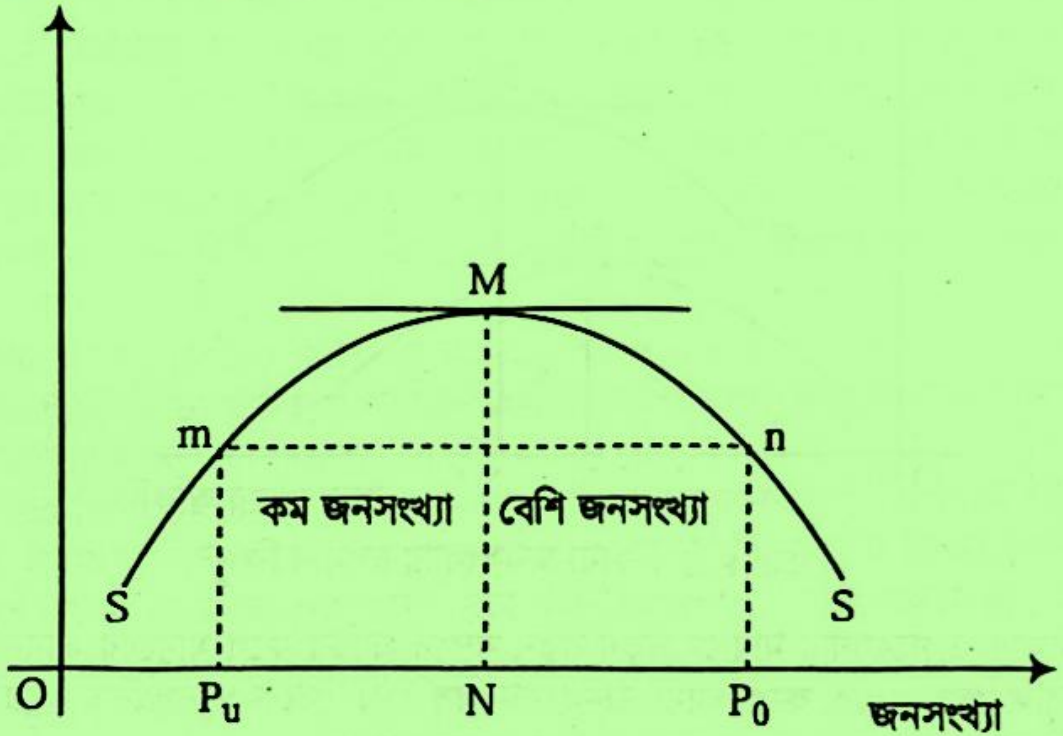

চিত্র ৪.৪ : কাম্য জনসংখ্যা

জনসংখ্যার ঘনত্ব

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে জনসংখ্যা ও লম্ব অক্ষে জীবনযাত্রার মান নির্দেশ করা হয়। SS রেখা হলো জীবনযাত্রার রেখা যাকে বলা হয় জনসংখ্যার একটি অপেক্ষক (Standard of living is the function of population) অর্থাৎ S = f(P),

এক্ষেত্রে হলো কাম্য জনসংখ্যা স্তর, f' * (P) > 0 হলে জনসংখ্যা কাম্যস্তর অপেক্ষা কম এবং f' * (P) < 0 হলে জনসংখ্যা কাম্যস্তর অপেক্ষা অধিক হয়। d/dP (S) = f' * (P) = 0

চিত্র থেকে লক্ষ্য করা যায়, ON জনসংখ্যা স্তরে M বিন্দুতে জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ। এরূপ জনসংখ্যাকেই Boulding কাম্য জনসংখ্যা বলেন। চিত্রে, OP』 হলো নিম্ন জনসংখ্যা (Under population) এবং OPO হলো অধিক জনসংখ্যা (Over population)। এরূপ ক্ষেত্রে দেশে প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় প্রকৃত জনসংখ্যা যথাক্রমে কম ও বেশি হওয়ায়, সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে জীবনযাত্রার মান কম হয়।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের ব্যবহারিক উপযোগিতা এবং তত্ত্বের মূল্যমান না থাকায় এটি অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়ছে। নিম্নে এ তত্ত্বের ত্রুটিসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. কাম্যস্তর নির্ধারণ জটিল কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব জনসংখ্যাবিষয়ক নিখুঁত তত্ত্ব নয়। কারণ এ কাম্য জনসংখ্যা স্তর কোথায় তা বলা কঠিন এবং পরিমাপ করাও কঠিন।

২. মাথাপিছু আয় সঠিকভাবে নির্ণয়ে অকার্যকর: মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্যই প্রায় অপর্যাপ্ত, ভুল এবং অবিশ্বাসযোগ্য যা কাম্য জনসংখ্যাকে সন্দেহজনক করে তোলে।

৩. বর্ধিত মাথাপিছু আয় বণ্টনে এ তত্ত্ব অসমর্থ: বর্ধিত জনসংখ্যার বর্ধিত আয় বণ্টনে এ তত্ত্ব অসমর্থ।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

৪. কাম্য জনসংখ্যার চলমান বিন্দু মানুষের জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে ক্রমাগত আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে সম্পদের পরিমাণগত এবং গুণগত পরিবর্তনের দ্বারা জীবনযাত্রার মানেরও পরিবর্তন ঘটছে। এ অবস্থায় কাম্যস্তরও পরিবর্তন হয়। অধ্যাপক ক্লার্ক মনে করেন জনসংখ্যাবিষয়ক কাম্যতার স্তর স্থির বিন্দু নয়। বিষয়টি নিচের চিত্রে দেখানো হলো-

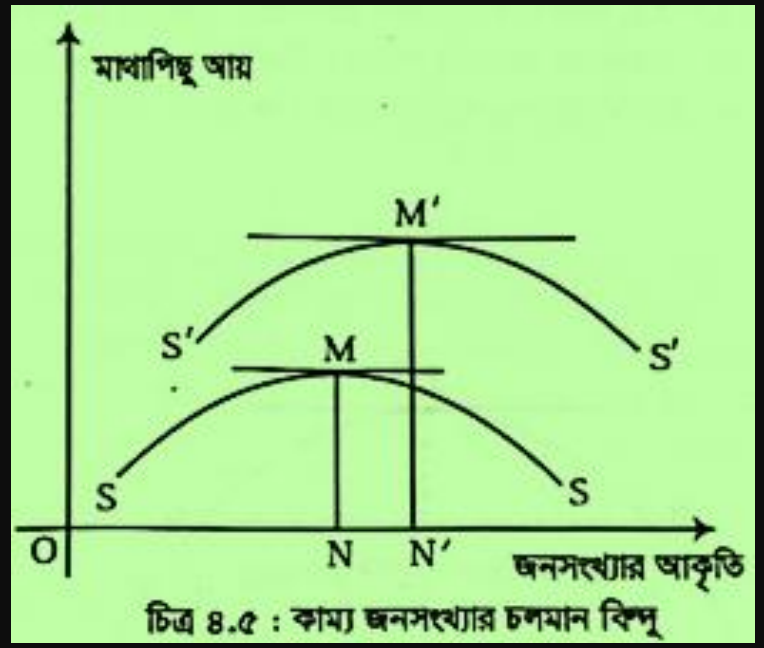

চিত্র ৪.৫ : কাম্য জনসংখ্যার চলমান বিন্দু

জনসংখ্যার ঘনত্ব

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

চিত্রে ক্রমাগত আবিষ্কার ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন সম্পদ প্রাপ্তির ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন হয়। মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কাম্য জনসংখ্যা স্তর ON থেকে স্থানান্তরিত হয়ে O * N' হয় এবং কাম্য জীবনযাত্রার মানেরও পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ কাম্যতার স্তর স্থির ধারণা নয় (Optimum level is not a static concept)

জনসংখ্যার ঘনত্ব

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

৫. তত্ত্বটি অব্যবহারিক ও অবৈজ্ঞানিক অধ্যাপক বি. কে. সরকার (B. K Sarker)-এর মতে, এ তত্ত্বটি অবৈজ্ঞানিক, তাই গুরুত্ব নেই এবং হিকস্ কর্তৃক সমর্থিত যে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই। অর্থনীতিবিদ মিরডাল (Myrdal)-এর মতে, "কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি বর্তমান জগতের সাথে সম্পর্কবিহীন একটি কল্পনাপ্রসূত ধারণা মাত্র।" ("The optimum theory is a speculative figment of the mind without any real connection with the world.")

৬. কাম্যতা ধারণা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত ম্যানুয়েল গট্ লিব (Manuel Gott Lieb)-এর মতে, "বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে কাম্যতাকে ব্যবহার করেন। যেমন- অর্থনৈতিক কল্যাণ, জীবনযাত্রার মান, প্রকৃত আয় ইত্যাদি।" এর ফলে কাম্যতার কাম্য ধারণা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্ব সম্পর্কে উপরিউক্ত বিভিন্ন সমালোচনা থাকায়, অনেক অর্থনীতিবিদ একে কোনো তত্ত্ব বলে স্বীকার করে না। তবে জনসংখ্যা ও মাথাপিছু সর্বোচ্চ আয়-এ দুটি উপাদান দ্বারা কাম্যতা তথা সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় নির্দেশক জনসংখ্যা ধারণা অর্থনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া, ম্যালথাসের তত্ত্ব নিরাশাবাদী, ভীতিকর, নিরানন্দময় ও অবাস্তব। সে তুলনায় কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের বিশ্লেষণের পটভূমি অধিকতর বাস্তব, বিস্তৃত ও যুক্তিনিষ্ঠ। এছাড়া জীবনযাত্রার মানের গতি নির্ধারণেও কাম্য জনসংখ্যার যথেষ্ট ভূমিকা বিদ্যমান। তাই ম্যালথাসের তত্ত্ব অপেক্ষা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আওতা, পরিধি অনেক প্রসারিত।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাম্য কি-না (Whether the Population of Bangladesh is Optimum): 'কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব' দেশে প্রাপ্ত মোট সম্পদের প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশে এখনও অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে প্রাপ্ত এদেশের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার এখনও হয়নি এবং মাথাপিছু আয়ও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাম্যস্তর অতিক্রম করেছে কি-না তা বলা সম্ভব না হলেও বর্তমানে চরম দরিদ্রতা, তীব্র বেকার সমস্যা, পুষ্টিহীনতা, সামাজিক অবক্ষয়সহ জীবনযাত্রার নিম্নমানের যে ভয়াবহ চিত্র বিরাজ করছে, তাতে বাংলাদেশকে অধিক জনসংখ্যার দেশ হিসেবে স্বীকার করাই বাস্তবসম্মত। বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে কাম্য আকারে উপস্থাপনের জন্য দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের মাধ্যমে, মাথাপিছু সম্পদ বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন সাধন আবশ্যক।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা

বাংলাদেশ একটি চরম দরিদ্রতম অতি জনবহুল দেশ। বর্তমানে এদেশে প্রতি বছর শতকরা ১.৩৩ ভাগ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।' প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১১৭১ জন লোক বাস করে। জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। জাতীয়ভাবে এদেশের ১৮.৭% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এরূপ অবস্থায় ২০০৭-০৮ সাল হতে দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র খাদ্য ও জ্বালানি সংকট এবং ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের কারণে পণ্যদ্রব্যের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি হতে ইউক্রেন যুদ্ধ পুনরায় পৃথিবীর সকল দেশকে জ্বালানি ও খাদ্য সংকটে ফেলেছে। ফলে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য চরম হতাশাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কোন পর্যায়ে রয়েছে তা নিম্নে পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো:

(ক) ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা: ১৭৯৮ সালে ম্যালথাস তাঁর 'Essay on the Principle of Population' গ্রন্থে জনসংখ্যা সম্পর্কে এক মতবাদে বলেন, জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে (যেমন-১, ২, ৪, ৮, ১৬...) দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে (যেমন-১, ২, ৩, ৪, ৫ ...)। ম্যালথাসের তত্ত্বের ভিত্তিতে বিচার করলে বাংলাদেশকে অতি জনবহুল দেশ বলা যেতে পারে। এর কারণসমূহ হলো:

১. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি বছর ১.৩৩ শতাংশ'। কিন্তু কৃষির বিভিন্ন উপখাতের মধ্যে শস্য উপখাতে প্রবৃদ্ধি ০.৮৮ শতাংশ। ফলে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে খাদ্য উৎপাদন সে হারে বাড়ছে না। অর্থাৎ খাদ্য ঘাটতি আমাদের দেশে লেগেই আছে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা

২. বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক নিরোধে দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হয়নি, যা ম্যালথাস আশঙ্কা করেছেন।

৩. ম্যালথাসের মতানুসারে প্রাকৃতিক নিরোধের ফলে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর উল্লিখিত প্রাকৃতিক নিরোধ যেমন-দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ বিগ্রহ, আত্মহত্যা প্রভৃতি বাংলাদেশে প্রায়ই ঘটে।

৪. বাংলাদেশে স্থূল জন্মহার প্রতি হাজারে ১৯.৪ জন এবং স্থূল মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৬.১ জন। সুতরাং অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে জন্ম ও মৃত্যুর হার অধিক। ম্যালথাসের মতে উচ্চ জন্মহার ও মৃত্যুর হার জনাধিক্যের গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

৫. বাংলাদেশে মাথাপিছু সর্বনিম্ন পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করতে ১.৮ একর জমি প্রয়োজন কিন্তু মাথাপিছু আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ০.৩৮ একর মাত্র যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে প্রতিটি মানুষের প্রয়োজনমতো খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬. বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ২৭৮৪১ মার্কিন ডলার যা উন্নত দেশের তুলনায় নগণ্য। এছাড়া, ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৩ শতাংশে। ২০২২ সালে দারিদ্র্যের হার দাঁড়ায় ১৮.৭ও চরম দারিদ্র্যের হার ৫.৬। 4

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা

৭. বাংলাদেশ বেকার সমস্যায় ভয়াবহভাবে আক্রান্ত। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী এ অর্থবছর শেষে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ৭৭ হাজার। পূর্বের অর্থবছর শেষে ছিল ২৫ লাখ ৯০ হাজার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের হার ১১.২ শতাংশ, পড়াশোনা যারা করেনি, তাদের মধ্যে বেকারের হার ১.৫ শতাংশ, প্রাথমিক শিক্ষা যারা নিয়েছেন তাদের মধ্যে ২.৭ শতাংশ, মাধ্যমিক পাস ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা বেকারের সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ ৩৮ হাজার।'১ কোভিড-১৯ পরবর্তী এ হিসাব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

৮. এদেশে জনাধিক্য সমস্যার সমাধানের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে সরকার, বিভিন্ন দাতা এবং সামাজিক সংস্থা উৎসাহিত করছে। এর ফলে জন্মহার সাফল্যজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে এবং ম্যালথাসের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কিছুটা কার্যকর হচ্ছে।

ম্যালথাস খাদ্য ও জনসংখ্যার ক্ষেত্রে যে অভারসাম্যের কথা বলেছেন, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত খাদ্য ঘাটতি সে কথাই প্রমাণ করে। এ প্রসঙ্গে Samuelson-এর ভাষ্য বাংলাদেশের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা ম্যালথাসের তত্ত্বকেও অনেকখানি মর্যাদা দিয়েছে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা

(খ) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা: কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী দেশের প্রাপ্ত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য যে জনসংখ্যা প্রয়োজন তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও জনাধিক্য ঘটেনি বলে মনে করতে হবে। দেশে যদি কাম্য জনসংখ্যা থাকে তাহলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন তথা জনগণের মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয় এবং জীবনযাত্রার মানও সর্বোচ্চ হয়। এছাড়া দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য অপেক্ষা কম হলে সে দেশকে 'নিম্ন জনসংখ্যার দেশ' এবং কাম্য অপেক্ষা বেশি হলে তাকে 'অধিক জনসংখ্যার দেশ' বলা হয়।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী, আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও এখনও জনাধিক্যের সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। তাঁদের যুক্তিসমূহ নিম্নরূপ:

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা

১. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক হলেও মৃত্যুহারও খুব বেশি। ফলে জনসংখ্যা যতটা বাড়ার কথা ততটা বাড়ে না।

২. বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় খুব কম হলেও তা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। যেখানে সত্তরের দশকের দিকে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল ২২০ মার্কিন ডলার, নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৫ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। বা. অর্থ. সমীক্ষা ২০২৪ অনুযায়ী এদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ২৭৮৪ মার্কিন ডলার।

৩. বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান কাঙ্ক্ষিত মানের নয়। দেশের এখনও ১৮.৭ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা

৪. বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ না হলেও কয়েকটিতে যেমন-প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি, সামুদ্রিক সম্পদ ইত্যাদিতে বেশ সমৃদ্ধ। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, এদেশের অনাবিষ্কৃত ও আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হলে জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়বে।

৫. বাংলাদেশের জনসংখ্যার আয়তন বিশাল এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হলেও আতঙ্কিত হওয়ার তেমন কারণ নেই। এ বিপুল জনশক্তির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ব চাহিদার আলোকে মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব হলে, তারা সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে।

যদিও বর্তমানে দেশের জনগণের মধ্যে বিদ্যমান বেকারত্ব, জীবনযাত্রার নিম্নমান, পুষ্টিহীনতা, রোগ-ব্যাধি বিদ্যমান, এমনকি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা এরূপ মৌলিক চাহিদারও অভাব রয়েছে। তাই অনেক অর্থনীতিবিদ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ বলে বিবেচনা করেন। তবে দেশের অনাবিষ্কৃত ও আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হলে এবং বিপুল জনসংখ্যাকে যথোপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদে রূপান্তর করে, কৃষির আধুনিকীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ, দ্রুত শিল্পায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করে, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টনব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে, মাথাপিছু আয় বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এর ফলে জনাধিক্যের সমস্যা কিছুটা সমাধান হবে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যে তুলনা

Comparison between Malthusian Theory and Optimum Population Theory

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব	কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব
ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে—	কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে—
১. জনসংখ্যার আধিক্য সম্পর্কেই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।	১. জনসংখ্যার স্বল্পতা ও আধিক্য উভয় এর ক্ষতিকর দিকের ইঙ্গিত প্রদান করে।
২. কেবল খাদ্য উৎপাদনের সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক দেখানো হলো।	২. উৎপাদন, মাথাপিছু আয়, অর্থনৈতিক দক্ষতা, জনগণের সমৃদ্ধি ইত্যাদির সাথে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বলে ধরা হয়।
৩. কৃষিক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধি কার্যকর ধরা হয়।	৩. এ তত্ত্বে কৃষিক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধিও কার্যকর বলে স্বীকার করা হয়।
৪. বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের বিষয়ে কোনো ধারণা নেই।	৪. বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে দেশের সম্পদের যে বৃদ্ধি ঘটে, তা এ তত্ত্বে ধারণা প্রদান করে।
৫. সংকীর্ণ ধারণা দেয় এবং পৃথিবীর জনবহুল দেশসমূহে এ তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ।	৫. প্রসারিত ধারণা দেয় এবং পৃথিবীর সকল দেশে এ তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।
৬. স্থবির ধারণা প্রকাশ পায়।	৬. তুলনামূলকভাবে ও তত্ত্বগতভাবে এ ধারণা কিছুটা উন্নত মনে হয়।
৭. এ তত্ত্ব অনেকটা কাল্পনিক এবং বাস্তবতা বিবর্জিত।	৭. এ তত্ত্ব অধিক বাস্তব বলে ধারণা করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৪ : জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

টপিক – ০৫ বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো-বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগলিক

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো-বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগলিক

This Topic is important for

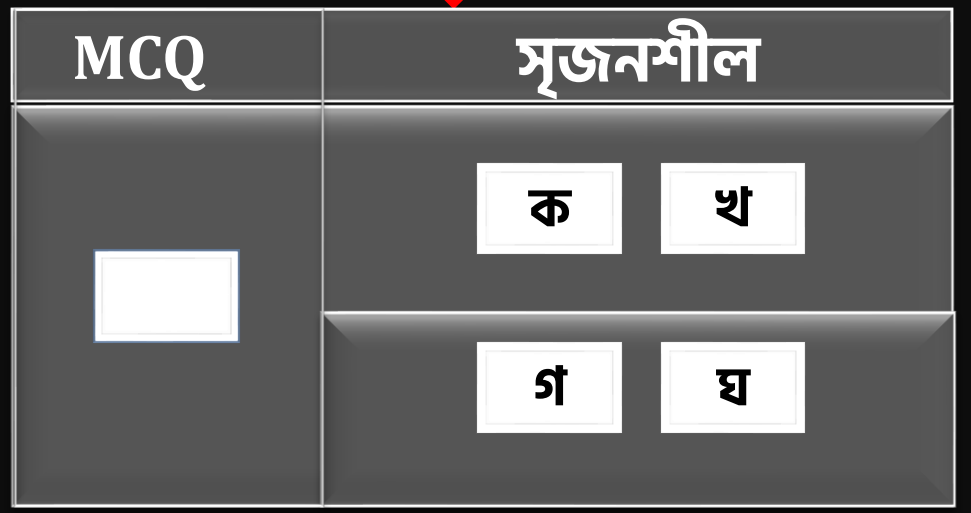

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো-বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগলিক

কোনো দেশের অর্থনীতিতে জনসংখ্যার প্রভাব কিরূপ, তা নির্ণয়ের জন্য জনসংখ্যার কাঠামোগত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি কাঠামোগত বিশ্লেষণ করা হলো:

১. বয়স অনুসারে জনসংখ্যা বণ্টন: কোনো দেশের জনসংখ্যার বয়স অনুসারে বণ্টন থেকে কর্মক্ষম লোকের পরিমাণ ও নির্ভরশীল লোকের পরিমাণ জানা যায়। সাধারণত শিশু (০-১৪) ও বৃদ্ধদের (৬০) কর্মক্ষম জনসংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। ১৯৬১ সালে পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে শিশু ৪৬.১%, বৃদ্ধ ৫.২% এবং কর্মক্ষম ৪৮.৭% যা ১৯৯১ সালে যথাক্রমে ৪৫.১%, ৫.৪% ও ৪৯.৫% এবং ২০১১ সালে যথাক্রমে ৩৪.৬৪%, ৭.৪৮% ও ৫৭.৮৮% এ দাঁড়ায়। জনশুমারি ও গৃহগণনা: ২০২২ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯১১ জন। এর মধ্যে ২৮ শতাংশ তরুণ, ৬২ শতাংশ কর্মক্ষম যাদের বয়স ১৫-৫৯ বছর। মোট জনগোষ্ঠীর ১১.৬৬ শতাংশ মানুষ ষাটোর্ধ্ব। এ থেকে বোঝা যায়, বর্তমানে নির্ভরশীল অপেক্ষা কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে। এ সুযোগকে দেশের নীতি নির্ধারক হতে শুরু করে সচেতন জনগণ সবাইকে কাজে লাগানো উচিত।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো-বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগলিক

২. পুরুষ-মহিলা হিসেবে জনসংখ্যার বণ্টন* : পুরুষ-মহিলা হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তান ও আজকের বাংলাদেশে একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো—

শুমারি বছর	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৯১	২০২১	২০২৩
পুরুষ-মহিলা অনুপাত	১০০ ঃ ১০৭.৭৬	১০০ ঃ ১০৭.৭	১০০ ঃ ১০৫.৮৬	১০০ ঃ ৯৮.১	৯৬.৩

সূত্র : Bangladesh Population Census : 1981, 1991, 2011; বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০২৪

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৪৯.৫১ শতাংশ পুরুষ এবং ৫০.৪৩ শতাংশ নারী।

সূত্র : প্রথা, ১০.৪.২০২৩

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো-বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগলিক

৩. জনসংখ্যার আয়তন: জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ এবং তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম প্রধান দেশ। বাংলাদেশে বর্তমানে (২০২২) জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯১১ জন। নিম্নের সারণিতে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি দেখানো হলো:

বছর	জনসংখ্যা (কোটি)
১৯৬১	৫.০৮
১৯৭৪	৭.৬৪
১৯৮১	৮.৯৯
১৯৯১	১১.১৪
২০০১	১৩.১৫
২০২৩	১৭.১০

সূত্র : Bangladesh Population Census : 1981 এবং 1991, * বা. অর্থ. সমীক্ষা–২০২৪

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো-বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগলিক

৪. জনসংখ্যার ঘনত্ব জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কোনো দেশের প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত লোক বসবাস করে তা বোঝায়। বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। বা. অর্থ, সমীক্ষা-২০২৪ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ১১৭১ জন। এছাড়া-

দেশ/অঞ্চলের নাম	প্রতি বর্গ কি. মি.-এ জনসংখ্যার ঘনত্ব
১. ইউরোপীয়ান নগররাষ্ট্র : মনাকো (Monaco)	২৬,১৫০ (৬৭,৭২৮/ প্রতি বর্গ মাইল)
২. চীনের অঞ্চল, ম্যাকাউ (Macau)	২১,৪২০
৩. সিঙ্গাপুর	৮,৩৫৮ (২১,৬৪৬ / প্রতি মাইল^2)
৪. হংকং (চীন)$_{২০১৭}$	৬,৬৫৯ (১৭,৩১১ / প্রতি মাইল^2)
৫. জিব্রাল্টার (Gibraltar)	৩,৩৬৯ (৮,৭২৬ / প্রতি মাইল^2)

Ref. UN (World Population Prospects–2019, World Bank

৫. গ্রাম ও শহরের মধ্যে জনসংখ্যার বণ্টন: গ্রাম ও শহরের মধ্যে জনসংখ্যার বণ্টন হতে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। সাধারণত উন্নত দেশের অধিকাংশ লোক শহরে বাস করে, কেননা নগরায়নের ফলে জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশে শহরের তুলনায় গ্রামে অধিক লোক বাস করে। World Development Report, 2000-2001 অনুযায়ী বাংলাদেশের শহরে লোকসংখ্যার পরিমাণ ১৯৮০ সালে ছিল মোট জনসংখ্যার ১৪% যা ১৯৯৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪% হয়। একই সময়ে কানাডাতে এ হার যথাক্রমে ৭৬% ও ৭৭% এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৭৪% ও ৭৭%। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে শহরে লোকসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩৫.৮%।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো-বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগলিক

বিগত দু'দশকে বাংলাদেশে শহরমুখী জনস্রোতের সারণি :

বছর	গ্রাম (%)	শহর (%)
১৯৯১	৮০.৩৭	১৭.৬৩
২০০১	৭৮.০০	২২.০০
২০১৭	৬৪.২	৩৫.৮

সূত্র : Bangladesh Demographic Profile-2018

জনশুমারি ও গৃহণনা ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রামে বসবাস করে মোট জনগোষ্ঠীর ৬৮.৩৪ শতাংশ, শহরে বাস করে ৩১.৬৬ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশে গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরছে মানুষ। ২০২১ সালে প্রতি হাজারে প্রায় ৬ জন শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরেছিলো যা ২০২৩ সালে উন্নীত হয় ১৪ জনে। ২০২২ সালে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর হওয়া মানুষের সংখ্যা প্রতি হাজারে ২৬.৪ হতে ২০২৩ সালে হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজারে ২০ জনে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো-বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগলিক

৬. পেশাভিত্তিক জনসংখ্যার বণ্টন: বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশ অন্যের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল, অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির এই সংখ্যা ৫.৬৭ কোটি।

নিম্নের তালিকায় বাংলাদেশের জনসংখ্যার পেশাগত বণ্টন দেখানো হলো:

বছর	কৃষিখাত	অকৃষিখাত
১৯৬১	৮৬%	১৪%
১৯৮১	৬১.৩%	৩৮.৭%
১৯৯১	৭৩.৮%	২৬.২%
২০১৩	৪৫.১%	৫৪.৯%
২০২৩	৪৫.০০%	৫৫.০%

৭. ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যার বণ্টন: বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান। তবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করছে। এদেশের মোট জনসংখ্যার ৮৯.১% মুসলমান, ১০% হিন্দু ও ০.৯% অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। (BDP-2016) জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী মুসলমান জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৯১ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর হার ৮.৯৫ শতাংশ।

৮. প্রথম বিবাহে গড় বয়স: ২০২০ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের প্রথম বিবাহে গড় বয়স পুরুষ ২৫.৪ বছর মহিলা ১৮.৮ বছর।

৯. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা: (i) ১৯৯৫/৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে হাসপাতালের শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ছিল ৩২২৯ জন যা ২০১৩-১৪ সালে ১৬৫২ জনে দাঁড়িয়েছে। (ii) ডাক্তারপ্রতি জনসংখ্যা ১৯৯৫/৯৬ সালে ৪৮৬৬ জন, ২০১৮ সালে ১৭২৪ জন।

১০. শিক্ষিতের হার (Literacy rate)*1: বাংলাদেশে শিক্ষিতের (সাক্ষরতার হার) হার খুবই কম। ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৩২.৪ ভাগ। ২০১৫ সালে এ হার ৬২.৬% এ উন্নীত হয়। অথচ যুক্তরাজ্যে শিক্ষিতের হার ৯৯% এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৯৮%। বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার কম হওয়ায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৭৭.৯%, পুরুষ ৮০.১% এবং মহিলা ৭৫.৮% শিক্ষিত। (২০২৩ এর প্রেক্ষিতে বা. অর্থ, সমীক্ষা-২০২৪)

১১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাংলাদেশ নামক এ ভূ-খণ্ডের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯৫১ সালের পূর্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার ছিল ১% এর নিচে কিন্তু পরবর্তীতে এ হার দ্রুত বাড়তে থাকে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো-বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগলিক

১২. জীবন সম্পৃক্ত পরিসংখ্যান :

	১৯৯৬	২০২৩
স্থূল জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে)	২৫.৬	১৯.৪
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জনে)	৮.১	৬.১
শিশু মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জীবিত জনে)	৭৬.৮	২৭

উৎস : বা. অর্থ. সমীক্ষা : ১৯৯৭, ২০২৪

১৩. নির্ভরশীলতার হার (Dependency ratio): বাংলাদেশে জনসংখ্যার নির্ভরশীলতার হার বর্তমানে হ্রাস পেয়েছে।

১৯৯১ সালের শুমারি অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫২.২০% (বর্তমানে প্রায় ৩৮%) নির্ভরশীল, যাদের বয়স কাঠামো ০-১৪ ও ৬০+। নির্ভরশীলতার হার অধিক হলে উন্নয়নের গতি মন্থর হয়। এক্ষেত্রে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পনামাফিক নিয়োগ করা সম্ভব হলে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি দ্রুততর বা কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছানো যায়।

১৪. ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা বণ্টন: বাংলাভাষা এদেশের মাতৃভাষা। তাই বাংলাদেশের ৯৯% জনগণ বাংলা এবং ১% জনগণ আরবি, উর্দু, ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষাভাষি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো-বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগলিক

১৫. প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল' অনুযায়ী জনসংখ্যার বণ্টন: প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বলতে দেশের জনসমষ্টির গড় আয়ুষ্কালকে বোঝায়। উন্নত দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল অত্যন্ত কম। যেমন-যুক্তরাষ্ট্রে গড় আয়ুষ্কাল ৭৮ বছর, যুক্তরাজ্যে ৭৪ বছর, জাপানে ৮৩ বছর, জার্মানিতে ৭৪ বছর। নিম্নে বাংলাদেশে প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কালের একটি সারণি দেওয়া হলো:

বছর	আয়ুষ্কাল (গড়)
১৯৬১	৪৪.৭২ বছর
১৯৭৪	৪৬.৫০ বছর
১৯৮১	৫৫.০০ বছর
১৯৯৯	৫৯.৫০ বছর
২০১১	৬৯.০০ বছর
২০২৩	৭২.৩ বছর*

সূত্র : Bangladesh Population Census : 1981 এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ এবং ইন্টারনেট।

১৬. উপজীবিকাভিত্তিক জনসংখ্যার বণ্টন: বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ জরিপ "Labour Force Survey-2023“ অনুযায়ী ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে মোট শ্রমশক্তি ৭.৩৫ কোটি। এর মধ্যে পুরুষ ৪.৮০ এবং মহিলা ২.৫৫ কোটি। মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৪৫ ভাগ কৃষিক্ষেত্রে, ১৭ ভাগ শিল্পক্ষেত্রে এবং ৩৮ ভাগ সেবাক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো-বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগলিক

১৭. দারিদ্র্য মানচিত্র : বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি : খানা আয়-ব্যয় জরিপ : ২০২২

সন	বিভাগ অনুযায়ী								সার্বিক দারিদ্র্য	অতি দারিদ্র্য
	ঢাকা	চট্টগ্রাম	সিলেট	বরিশাল	খুলনা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	রংপুর		
২০১৬	১৬%	১৮.৪%	১৬.২%	২৬.৫%	২৭.৫%	৩২.৮%	২৮.৯%	৪৭.২%	২৪.৩%	১২.৯%
২০২২	১৭.৯%	১৫.৮%	১৭.৪%	২৬.৯%	১৪.৮%	২৪.২%	১৬.৭%	২৪.৮%	১৮.৭%	৫.৬%

বিবিএস এর খানা আয় ব্যয় জরিপ-২০২২ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ের মতো বিভাগওয়ারি দারিদ্র্যের চিত্রও পাল্টে গেছে। এখন সর্বোচ্চ দারিদ্র্যের হার রংপুরে নয়, বরিশাল বিভাগে। গত ছয় বছরে ঢাকা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে। অন্যান্য বিভাগে দারিদ্র্যের হার কমেছে, অধিক কমেছে রংপুর, খুলনা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগে। দেশে বর্তমানে সার্বিক দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ যা ছয় বছর পূর্বে ২০১৬ সালে ছিল ২৪.৩ শতাংশ। অতি দরিদ্র্যের হারও এখন ৫.৬% যা ২০১৬ সালে ছিল ১২.৯ শতাংশ।

দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে কম চট্টগ্রাম বিভাগে। অতি দারিদ্র্যের হিসাবে ঢাকার অবস্থান সবচেয়ে ভালো। মাত্র ২.৮ শতাংশ অতি দারিদ্র্যের বাস এ বিভাগে। গ্রামীণ অতি দারিদ্র্যও ঢাকায় সবচেয়ে কম, মাত্র ১.৯ শতাংশ। বরিশাল বিভাগে অতি দারিদ্র্যের হার ১১.৮ শতাংশ (জাতীয়ভাবে ৫.৬ শতাংশ)। অর্থাৎ বরিশালে অতি দারিদ্র্যের হার দেশের গড় দারিদ্র্যের হারের দ্বিগুণেরও বেশি। গ্রামীণ অতি দারিদ্র্যের হার জাতীয়ভাবে ৬.৫ শতাংশ। বরিশালে সর্বোচ্চ ১৩.১ শতাংশ, ঢাকা বিভাগে ১.৯ শতাংশ।

জাতীয় পর্যায়ে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশ। গ্রামীণ দারিদ্র্যের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে খুলনা (১৬.২ শতাংশ)। রংপুরে নগর দারিদ্র্য সর্বোচ্চ ২৯.৯ শতাংশ, বরিশালে এ হার ২৮.৪ শতাংশ, জাতীয়ভাবে ১৪.৭ শতাংশ। নগর অতি দারিদ্র্যেও সর্বোচ্চ রংপুর বিভাগে (৩০.৫ শতাংশ), নগর অতি দারিদ্র্যে দ্বিতীয় ময়মনসিংহে (১৭.৬ শতাংশ), বরিশাল তৃতীয় (১৪.৫ শতাংশ)। নগর অতি দারিদ্র্যের জাতীয় হার ১২.৯ শতাংশ।

১৮. জেলাভিত্তিক জনসংখ্যার বণ্টন জেলাভিত্তিক বিবেচনায় ঢাকা জেলা সর্বাধিক জনবহুল। পক্ষান্তরে বান্দরবান জেলা সবচেয়ে কম জনবহুল। বিভাগ অনুসারে ঢাকা বিভাগে সর্বাধিক ও বরিশাল বিভাগে সর্বনিম্ন জনসংখ্যা বিদ্যমান। ঢাকা বিভাগে মোট জনসংখ্যার ২৬.৮৮ শতাংশ (১ম), চট্টগ্রাম বিভাগে ২০ শতাংশ (২য়), রাজশাহী বিভাগে ১২.২৪ শতাংশ (৩য়) এবং সবচেয়ে কম বরিশাল বিভাগে সাড়ে ৫ শতাংশ মানুষ বাস করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের জনসংখ্যার গঠনপ্রকৃতি ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হতে দেখা যায় যে, ভৌগোলিক আয়তনের তুলনায় আমাদের দেশের লোকসংখ্যা যেমন বেশি তেমনি গুণগত দিক থেকেও বাংলাদেশের জনশক্তির দক্ষতা বিশ্বমানের বা কাঙ্ক্ষিত মানের নয়। এছাড়া, আমাদের জনসংখ্যার প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কম, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি, নির্ভরশীলতার হারও তেমন কম নয়, শহরে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা কম এবং মানসম্পন্ন শিক্ষার হারও উল্লেখযোগ্য নয়। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের জনসংখ্যার গঠনপ্রকৃতি ও গুণগত মান অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৪ : জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

টপিক – ০৬ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে এ ভূখণ্ডের জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি। এ সংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছিল ২১০ বছর। এরপর এ ভূখণ্ডে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লাগে ৮০ বছর। তারপর ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ, ৩০ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়।

বছর	অবিভক্ত বঙ্গদেশ	বাংলাদেশ এলাকা
১৯৪১	৬০, ৩০৬, ৫২৬ জন	৪১, ৯৯৭, ২৯৭ জন
১৯৫১		৪২, ০৬২, ৬১০ জন
১৯৮১		৮৭, ১২০, ১১৯ জন
২০০১		১২৪, ৩৫৫, ২৬৩ জন

উৎস : Census of India (1931, 1941), Bangladesh Population Census 1991, 2001, বাংলাপিডিয়া-১, পৃ: ১৮৭

এভাবে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্রায়তন এবং সীমিত সম্পদবিশিষ্ট দেশের জন্য এ পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে গভীর উদ্বেগজনক।

তাই স্বাধীনতার পর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এ লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। এরপর হতে এখন পর্যন্ত সরকার দেশীয় এবং দাতা সংস্থার সহযোগিতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নানারূপ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন:

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

(i) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি জোরদারকরণ। পরিবার পরিকল্পনা বলতে প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবারকে বিদ্যমান মাথাপিছু সম্পদ ও সুযোগের প্রেক্ষিতে পরিবারের আয়তনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে উদ্যোগী হওয়া। এর ফলে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবনযাত্রার মান উন্নত ও সুনিশ্চিত হবে। এক্ষেত্রে জনবহুল দরিদ্রদেশে পরিবার পরিকল্পনা বলতে জনসংখ্যা হ্রাসকে এবং ধনী ও উন্নত দেশসমূহে যেখানে সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম, সেখানে পরিবার পরিকল্পনা বলতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বোঝায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এটি হলো Children by choice, not by Chance. অর্থাৎ সন্তান জন্মদান ঘটনাক্রমে নয়, পছন্দমতো হওয়াই পরিবার পরিকল্পনার মূল অর্থ। বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার ২০২৩ সালে ৬২.১ শতাংশ এবং তা এখনো থমকে আছে।

(ii) ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯৯২ সালে ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয় এবং ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাস হতে সারা দেশে তা সম্প্রসারিত করা হয়। দারিদ্র্যজনিত ঝরে পড়া (dropout) রোধ করতে ১৯৯৩ সালে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি এবং ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি থেকে দেশব্যাপী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ছাত্রীদের উপ-বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১, ডেল্টা পরিকল্পনা-২১০০ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নপূর্বক আরও আধুনিকায়নের কাজ চলছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুকে মানসম্মত প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর সংখ্যা বৃদ্ধি, গুণগত শিক্ষক নিয়োগ, ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষাকে উন্নীতকরণ প্রভৃতি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন চলছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

(iii) শিশুদের নিকট শিক্ষাকে আকর্ষণীয় এবং বিশ্বমানের করার লক্ষ্যে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ই-লার্নিং চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রতিটি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

(iv) SDG*1 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জোরদার, পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need) পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্যভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

বর্তমানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোট প্রজননহার (Total Fertility Rate-TFR) বেশি এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার (CPR) কম। এ অবস্থায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর TFR হ্রাস ও CPR বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ করে বস্তি এলাকা, চরাঞ্চল, দুর্গম এলাকা, অনগ্রসর পল্লি এলাকা ও হাওর এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

(v) জনসংখ্যা সমস্যার ভয়াবহতা রোধে ২০২১ সালের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণসামগ্রী ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।' কিন্তু অনেক প্রতিকূলতা এবং অনীহার কারণে এ হার অর্জন সম্ভব হয়নি, তবে চেষ্টা চলছে।

(vi) সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ প্রণীত হয়েছে এবং জাতীয় ঔষধ নীতিকে (২০১৬) যুগোপযোগী করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, মাতৃ মৃত্যুহার ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আমাদের অগ্রগতি ঈর্ষণীয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

(vii) মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের জন্য উপজেলা পর্যায়ে 'মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি', সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় মাতৃসদন, নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে দরিদ্র নগরবাসীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। এসব সেবাসমূহের শতকরা ৩০ ভাগ বিনামূল্যে দেয়া হয়। এর পাশাপাশি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিকেও জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

(vii) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সারা দেশে ১৪,১৪১টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে সমগ্র দেশে গ্রামীণ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম তদারকি করা, ৩০ ধরনের ওষুধ সরবরাহ করা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা করা হচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন সেবা প্রার্থী প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করেন এবং এদের ৯৫ শতাংশই নারী ও শিশু।

(ix) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও মান উন্নয়নে সরকার জনবল ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ওপরও গুরুত্ব দিয়েছে। এ লক্ষ্যে সকল উপজেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় এবং জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, জনসংখ্যা অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি; চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর অনুপাত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ১:৩:৫ এ উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে মানসম্পন্ন মেডিকেল কলেজ, ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি, নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করার জন্য অনুমোদন দেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

(x) চিকিৎসা সেবায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। ই-হেলথ কর্মসূচি চালু, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ, টেলিমেডিসিন সুবিধা প্রভৃতির মাধ্যমে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের রোগীরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে সক্ষম হচ্ছেন। এর মাধ্যমে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি, ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর সময়সূচি, গর্ভধারণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনগণকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

(xi) বাংলাদেশ পুষ্টির ক্ষেত্রে MDG** লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য 'জাতীয় পুষ্টি সেবা' কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো, মাতৃদুগ্ধ পানে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রসূতি মা ও শিশুকে সম্পূরক খাবারের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। শিশু যদি ধারাবাহিকভাবে অপুষ্টিতে ভোগে, তাহলে তার উচ্চতা, বয়সের তুলনায় কমে যায়, শিশু খর্বাকৃতির হয় এবং কৃশকায় (ওয়াসটিং) পরিণত হয়। জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৭-১৮ থেকে দেখা যায় বয়সের তুলনায় কম ওজনের শিশুর হারও কৃশকায় পরিণত হওয়ার হার হ্রাস পেয়েছে। ২০০৭ সালে কম ওজনের শিশুর হার ৪৩ শতাংশ থেকে বর্তমানে তা ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। কৃশকায় শিশুর হার উক্ত সময়ে ১৭% থেকে ৮%-এ নেমে এসেছে।

(xii) সরকার নারীশিক্ষার প্রসার, কর্মক্ষেত্রে নারীদের কোটা পদ্ধতির দ্বারা অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে নারীর সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। এর ফলে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

(xiii) বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধে সরকার আইন প্রণয়ন করেছে। দেরীতে বিবাহ, ছোট পরিবার গঠনে জনমত সৃষ্টিতে সরকার প্রচার কার্যক্রম জোরদার করেছে।

(xiv) বিভিন্ন শ্রেণিতে পাঠ্যক্রমে সরকার জনসংখ্যা বিষয়ক শিক্ষাদান বিষয়টি গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর ফলে জনসংখ্যা হ্রাসের পক্ষে জনসচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে।

সংক্ষেপে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো- জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও উপযুক্ত শিক্ষার প্রসার, ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তদারকি জোরদার, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জনসংখ্যার আন্তর্জাতিক স্থানান্তর, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন এবং আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগ ইত্যাদি পদক্ষেপসমূহ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কর্মসূচির কার্যকারিতা: ১৯৬৫ সাল হতে সরকারি পর্যায়ে পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম শুরু হবার ফলে বাংলাদেশের দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষার হার কম হওয়া সত্ত্বেও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নারীশিক্ষার প্রসার ও সক্ষমতা বৃদ্ধির নানা উদ্যোগও এক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। অদ্যাবধি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে আধুনিক ও কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ। জন্ম প্রতিরোধক সামগ্রী ব্যবহারের হার ১৯৭৫ সালে ৮ শতাংশ হতে ২০২৩ সালে ৬২.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ফলে মোট প্রজননহার ১৯৭১-৭৫ সালে ৬.৩ হতে ২০২৩ সালে ২.১৭ এ নেমে এসেছে। প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে নবজাতক শিশু মৃত্যুহার, মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে, স্কুল জন্মহার, স্থূল মৃত্যুহার জাতীয় এবং গ্রামীণ পর্যায়ে হ্রাস পেয়েছে। যেমন-

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

ক. স্বাস্থ্য সেবায় প্রশিক্ষিত সেবাকর্মী দ্বারা মায়েদের প্রসব পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সেবা প্রদানের হার পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ. বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি লাখ জীবিত জন্মে ২০১৪ সালে ১৯৭ থেকে ২০২৩ সালে ১৩৬০। শতাংশে নেমে এসেছে।

গ. ১৯৯১ সালে কম ওজনের প্রায় ৬৬ শতাংশ শিশু জন্ম গ্রহণ করতো যা বর্তমানে ২২ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে।

ঘ. স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে) ২০০৩ সালে ২০.৯, যা ২০২৩ সালে দাঁড়ায় ১৯.৪।

ঙ. ২০০৩ সালে প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ছিল ৬৪.৯ যা ২০২৩ সালে ৭২.৩ এ দাঁড়িয়েছে।

অর্থাৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কর্মসূচির ফলে প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ও জীবনযাত্রার মান পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। নাগরিক জীবনের বিভিন্ন প্রত্যাশা বা চাহিদার প্রসার ঘটায় এখন অধিক সন্তান না নিয়ে পরিবার ছোট রাখার প্রতি বেশির ভাগ মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে। উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনের আশায় মানুষ ছোট পরিবার নিয়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরে লিপ্ত রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৪ : জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

টপিক – ০৭ মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে দেশের জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা সুবিধা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দক্ষ মানবগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলাকে বোঝায়। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, ভৌত বা প্রাকৃতিক পুঁজি (Physical Capital) অর্থাৎ কলকজা, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা, জমিজমা ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় যদি মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সুষ্ঠু বিনিয়োগের দ্বারা দক্ষ, শিক্ষিত ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী জন্ম না দেওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে শুলজের (T. W. Schultz) একটি উদাহরণ স্মরণ করা যায়:

মনে করি, একটি দেশের এরূপ অর্থনীতি রয়েছে, যেখানে আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই ভৌত সম্পদ রয়েছে বা অর্থ ও সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে। কিন্তু সেদেশে ট্রেনিংপ্রাপ্ত বা স্কুলে পড়েছে এরূপ একটি লোকও নেই, দেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে চিন্তা করার মতো ক্ষুদ্র জ্ঞানসম্পন্ন কোনো লোক নেই, প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় সীমাবদ্ধ এবং জনগণের গড় আয়ু ৪০ বছর। নিশ্চিতভাবে এরকম দেশের উৎপাদনব্যবস্থায় মহাধ্বংস নেমে আসবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

অর্থনীতিবিদ জে. ডি. সেথি (Prof. J. D. Sethi) বলেন, "মানবসম্পদ উন্নয়ন যদি সামগ্রিক উন্নয়ন হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহলে তা মানুষের ভেতরে বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিক, কারিগরি, উদ্যোক্তীয় এমনকি নৈতিক সামর্থ্যগুলোর সর্বাধিক ব্যবহার বোঝায়-এটি নতুন নতুন সামর্থ্য সৃষ্টিও বোঝায়।" ("Human resource development, if taken as total development means optimum utilization of existing human capacities intellectual, technological, entreprenurial and even moral and creation of new ones." Ref: Human Resource Development 1, Mainstream, April 26, 1986.)

মানবসম্পদ উন্নয়ন

অনুন্নত এবং বিকাশমুখী দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন একটি বহু প্রার্থিত বিষয়। এসব দেশের বেশির ভাগ মানুষ নিরক্ষর, অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ যা অর্থনীতিতে বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অনুন্নত দেশের মানবসম্পদের এ দুরবস্থা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ এফ. এইচ. হারবিসন (F. H. Harbison) যে বক্তব্য দেন, তা সংক্ষেপে নিম্নে দেয়া হলো:

উন্নয়নশীল দেশের মানবসম্পদ সমস্যা দ্বিবিধ। এ ধরনের দেশের আধুনিক খাতে একদিকে যেমন দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনসম্পদের অভাব, তেমনি কৃষি বা ঐতিহ্যবাহী খাতে অতিরিক্ত জনসম্পদের অস্তিত্ব রয়েছে। মানবসম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর উন্নয়নে টি. ডব্লিও, শুলজ (T. W. Schultz) নিম্নের কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেন:

(১) স্বাস্থ্য সুবিধা ও সেবাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা। এর ফলে জনগণের আয়ু, স্বাস্থ্যবল, উদ্যম, উদ্দীপনা এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(২) কর্মস্থলে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(৩) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার প্রসার।

(৪) বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং

(৫) পরিবর্তনশীল কর্মসুযোগ গ্রহণের প্রয়োজনে ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্যে গণচলাচলের জন্য উৎসাহ প্রদান।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

অর্থনীতিবিদ মিরড্যাল (Gunar Myrdal) মানবসম্পদ উন্নয়নের আটটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেন। যথা-(১) খাদ্য ও পুষ্টি, (২) বস্ত্র, (৩) বাসস্থান ও তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা, (৪) স্বাস্থ্য সুবিধা, (৫) শিক্ষা, (৬) গণসংযোগ মাধ্যম, (৭) শক্তি ভোগ ও (৮) পরিবহণ।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে দক্ষ মানবসম্পদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সত্ত্বেও যদি জনগণকে অপুষ্টি, নিরক্ষরতা ও স্বাস্থ্যহীনতার অভিশাপমুক্ত করা না যায়, তাহলে সে প্রবৃদ্ধি অর্জন অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তাই শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের তাগিদেই নয়, মানবসম্পদ উন্নয়ন পৃথকভাবেই একটি ঈপ্সিত লক্ষ্য।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন হচ্ছে জনগণ ও সরকারের মধ্যে স্বাধীনতার মধ্যস্থতাকারী একটি প্রক্রিয়া। এর জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্র বা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে, তা হলো-

(i) অর্থনৈতিক সুযোগ: যেমন-প্রকৃত আয়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, খাস জমিতে গরিব মানুষের অধিকার ইত্যাদি।

(ii) সামাজিক সুবিধা: যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্য (প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা), বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা ইত্যাদি।

(iii) রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুযোগ অর্থাৎ মানুষ রাষ্ট্র পরিচালন প্রক্রিয়ায় স্বাধীনভাবে অংশ নিতে পারবে।

(iv) স্বচ্ছতার গ্যারান্টি-অর্থাৎ জনগণ রাষ্ট্রের নিকট থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা ও সেবা পাবে, সে সম্পর্কে তাদেরকে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান এবং

(v) জনগণের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষার নিশ্চয়তা।

মানবসম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম।

মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নির্দিষ্ট খাতসমূহ হলো-(i) শিক্ষা, (ii) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, (iii) নারী ও শিশু উন্নয়ন, (iv) যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, (v) সমাজকল্যাণ ও (vi) সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসাধারণকে দীর্ঘসময় ব্যাপী, সুস্বাস্থ্যময় এবং পরিপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ প্রদান করা উচিত। এজন্য সমাজে নারী ও শিশুদের অবস্থার উন্নয়নে পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাসন অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ:

ক. শিক্ষা ও প্রযুক্তি (Education and Technology): দেশের উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সঠিক শিক্ষা কাঠামো এবং যথাযথ শিক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ লক্ষ্যে শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ এর দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে "জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০" ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে। ‘‘জাতীয় শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর ৪নং লক্ষ্যমাত্রায় 'সকলের জন্য

মানবসম্পদ উন্নয়ন

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির' কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও আধুনিকায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা সম্পর্কিত গৃহীত কর্মসূচিসমূহ হলো-

১. রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভুক্ত খাত হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য উপযুক্ত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২. সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে যেসব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, উপবৃত্তি প্রকল্প, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কার্যক্রম, মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩. সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিনামূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১০ সাল হতে ১০০% নতুন বই জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সমগ্র দেশে বিতরণ করছে।

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে প্রাথমিক স্তরের পাশাপাশি সারাদেশে মাধ্যমিক, দাখিল, কারিগরি ও এবতেদিয়া স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করছে।

৫. প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের উপবৃত্তি প্রদান করে সরকার দরিদ্র পরিবারের সন্তানদেরকে পড়ালেখার ধারায় যুক্ত থাকার জন্য প্রণোদনা বা উৎসাহ প্রদান করছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

৬. অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস দেশের যুব সমাজকে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থান ও বৈদেশিক শ্রম বাজারে রপ্তানি উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরির ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

৭. শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

৮. পাঠদানের পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে এ হার বর্তমানে ২০২৩ সালে প্রায় ৭৭.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।"

৯. শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষা বৈষম্য কমিয়ে আনতে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেই এরূপ উপজেলায় একটি করে উচ্চ বিদ্যালয়কে মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে।

১০. উচ্চ শিক্ষাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী করার লক্ষ্যে পুরাতন জেলা শহরগুলোতে সরকারিভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

খ. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ (Health and Family Welfare in Bangladesh): সুস্বাস্থ্য জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহের একটি। জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান জাতি তৈরি করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বাস্থ্য সেবার গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাস্থ্য সংবিধান-স্বীকৃত একটি মৌলিক অধিকারও। এ মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য খাতকে অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রহণ করেছে। গত দশকে দেশের স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এর ফলে প্রজননহার ও মৃত্যুহার কমেছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। স্বাস্থ্য উন্নয়ন খাতে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ হলো:

(i) সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১; জাতীয় ঔষধ নীতি যুগোপযোগী করা হয়েছে।

(ii) শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ই.পি.আই), ডায়রিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (সি. ডি. ডি) এবং শ্বাসতন্ত্রের মারাত্মক সংক্রমণ (এ আর ই) প্রতিরোধ কর্মসূচিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মা ও শিশু মৃত্যুর হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রার নিচে নামানোর মাধ্যমে এমডিজি-৪ অর্জন এবং অন্যান্য সূচকসমূহ প্রত্যাশিত মাত্রায় হ্রাসের ফলশ্রুতিতে এ দেশ বিশ্বের মধ্যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রতিরোধযোগ্য শিশু মৃত্যু বন্ধ করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

(iii) সকলের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ১৪,১৪১টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

(vi) মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে দরিদ্র সন্তানসম্ভবা মহিলাদের জন্য উপজেলাভিত্তিক 'মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি' চলমান রয়েছে।

(vii) সরকার যুগোপযোগী জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করেছে। এ নীতির লক্ষ্য হলো- বিপুল এ জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিশ্চিত করা।

(viii) জনসংখ্যা সমস্যার ভয়াবহতা রোধে ২০২১ সালের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু নানা প্রতিকূলতা ও অনীহার কারণে এ হার অর্জিত হয়নি। বর্তমানে এ হার ৬২.১ শতাংশ।

(ix) স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে সরকার সকল উপজেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় এবং সকল জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(x) চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর অনুপাত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ১:৩:৫ এ উন্নীত করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

(xi) চিকিৎসা সেবায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ই-হেলথ কর্মসূচি, টেলিমেডিসিন, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে।

(xii) পুষ্টি সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য 'জাতীয় পুষ্টি সেবা' কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে পুষ্টি কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের হার, মা ও শিশুকে সম্পূরক খাবারের আওতায় আনা, মাতৃদুগ্ধপানে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

গ. আবাসন (Housing): আবাসন বা বাসস্থান মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম প্রধান উপাদান। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ সমস্যা প্রকট হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৩০ ভাগ পরিবারের নিজস্ব বাড়ি নেই, যা-ও রয়েছে তার প্রায় ৮০ ভাগ কাঁচা বাড়ি। নগরায়নের ফলে এ সমস্যা শহরাঞ্চলেও তীব্র হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব স্বাস্থ্যকর বাসস্থান বা আবাসন মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শিশু থেকে যুবক, মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণ গঠনে, মেধা ও মনের বিকাশে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর আবাসন বড় ভূমিকা পালন করে। আবাসন খাত উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ হলো:

(i) সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়নের লক্ষ্যে 'গৃহায়ন তহবিল' গঠন করেছে। সকলের জন্য আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহর এবং জেলা ও উপজেলা শহরে ৭৫,৬৮৮টি প্লট ও ২,১২,৯৯৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

(ii) ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার পাশাপাশি অপরিকল্পিত নগরায়ন বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা। সুপরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে এ বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে 'রূপকল্প-২১' অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য আবাসন ও আধুনিক মানসম্মত নগরজীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেকাংশে সফল হয়েছে।

(iii) ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারের আশ্রয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

(iv) ইকনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের চর, হাওর-বাঁওড় এবং জলাবদ্ধ ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার অতি দরিদ্র পরিবার প্রতি ১৫ হাজার টাকার সম্পদ প্রদানসহ খাসজমি প্রদান করা হচ্ছে। চর জীবিকায়ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন চরাঞ্চলে আবাসন ও জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(v) প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এক্ষেত্রে যাদের ভূমির পরিমাণ ৫০ শতক অপেক্ষা কম বা ভূমিহীন তারা এ প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাচ্ছে।

(vi) ছিন্নমূল অসহায় মানুষ যারা বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপন করছে, তাদের জন্য সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল হতে 'ঘরে ফেরা' নামক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

(vii) ঢাকার চারপাশে চারটি স্যাটেলাইট টাউন পিপিপি'র আওতায় নির্মাণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে মালয়েশিয়া সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(viii) পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ ইমারত নির্মাণের লক্ষ্যে Bangladesh National Building Code (BNBC) সংশোধন করা হয়েছে। রিয়েল এস্টেট ব্যবসাকে এক পতাকাতলে নিয়ে আসার জন্য সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

(ix) আবাদযোগ্য জমি সুরক্ষার পাশাপাশি নগর অঞ্চল পরিকল্পনা ও বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পে ভূমির ব্যবহারকে আইনি বাধ্যবাধকতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

ঘ. নারী উন্নয়ন কর্মসূচি (Women Development programme): দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী। কাজেই নারী উন্নয়ন ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়নের আশা করা সুদূর পরাহত। তাই সরকার নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করে একটি যুগোপযোগী নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছে। ২০১৭ সালে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ১৪৪টি দেশের তথ্যের ভিত্তিতে ১৪টি সূচকের মধ্যে ৪টিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১ নম্বরে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি, সরকার প্রধানের সূচকে এবং জন্মের সময় নারী-পুরুষ অনুপাতে বাংলাদেশ ১ নম্বরে। নারী-পুরুষ সমতায় বাংলাদেশের অবস্থান আরও দৃঢ় এবং দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ স্থানে বাংলাদেশ।

(i) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করার লক্ষ্যে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জনের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু রয়েছে।

(ii) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক কর্মসূচির আওতায় নারী ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উন্নয়ন, মহিলাপ্রতি প্রজননহার হ্রাস করা, প্রসূতি মৃত্যুর হার কমানোসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

(iii) প্রসূতি ও নবজাতকের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।

(iv) ইভ-টিজিংসহ নারীর প্রতি সকল ধরনের সামাজিক অপরাধরোধকল্পে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

(v) নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রণয়ন করা হয়েছে 'পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন-২০১০'।

(vi) অন্যান্য ধর্মাবলম্বী (হিন্দু) নারীদের ব্যক্তি অধিকার সুরক্ষার জন্যও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(vii) কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা, শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করতে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

(viii) বাংলাদেশে নারীর কর্মক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে। বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও আইন সভাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৫০ এ উন্নীত করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তিনজন করে নির্বাচিত নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রাখা হয়েছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) ২০২৩-২৪ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বিশ্বের ১৮৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান এক ধাপ এগিয়ে ১২৯তম।" এখানে আরও উল্লেখ করা হয় ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশের নারীদের ক্ষমতায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ও অন্যান্য অনেক সামাজিক সূচকে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ।

(ix) উত্তরবঙ্গের ৩টি জেলায় ৮০ হাজার হতদরিদ্র মহিলা ও প্রান্তিক চাষিকে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

ঙ. শিশু উন্নয়ন (Child Development): শিশুদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে এবং শিশু কল্যাণে শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ, পুষ্টি, শিক্ষা ও বিনোদনের কোনো বিকল্প নেই। তাই শিশু-কিশোর কল্যাণে জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, শিশুর জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু নির্যাতন বন্ধ, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বৈষম্য বিলোপ সাধনে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় অনেক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০ এবং জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(i) শ্রমজীবী শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা থেকে সরিয়ে এনে মৌলিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(ii) পথশিশুদের নিরাপদ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ৬টি বড় শহরে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন

(iii) নারী ও শিশু পাচার রোধে জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া পাচারের কাজে ব্যবহৃত সম্ভাব্য সবকটি স্থানে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী

(iv) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, দুঃস্থ ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালন পালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন, পরিত্যক্ত নবজাতক শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালনা করছে।

(v) কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা/চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম, সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়, অটিজম রিসোর্স সেন্টার, অটিস্টিক স্কুল স্থাপন, ব্রেইল প্রেস, প্লাস্টিকসামগ্রী উৎপাদনকেন্দ্র, মিনারেল ওয়াটার প্লান্ট ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র অন্যতম। কাবর

(vi) দেশের বিশাল শিশু-কিশোর ও যুব সম্প্রদায়কে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়- প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হলো সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা দরকার:

১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ : মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ মূল্যবোধ সৃষ্টি, দক্ষ শ্রমিক ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি, গবেষণা ও উন্নয়ন, 'জনগণের উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি, গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং কাজের গুণগত মান উন্নত করে। তাই দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করে, আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করে শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

২. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন: অসুস্থ ও দুর্বল জনগণ দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুষম খাদ্য গ্রহণ, উপযুক্ত বাসস্থান, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার মৌল উপাদান যার কোনোটিই আমাদের দেশে সহজলভ্য নয়। ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বল ও কর্মবিমুখ। এ অবস্থার উন্নতি করতে হলে দেশে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়- প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

৩. খাদ্য ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ: বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যার সমাধান করতে হবে।

৪. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এ অবস্থায় তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা সুবিধা প্রভৃতি মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। আমাদের জনসংখ্যার গুণগতমান বৃদ্ধি করতে হলে ব্যাপক জন্মশাসন ও শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে জনসংখ্যার অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি রোধ করতে হবে।

৫. গ্রামীণ উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ: বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। তাই এদেশের জনসম্পদের গুণগতমান বাড়াতে হলে দেশের পল্লি অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

৬. বিনিয়োগ বৃদ্ধি: বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। তা সত্ত্বেও মানবসম্পদ উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সরকারকে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ রচনা করতে হবে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়- প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

৭. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর মৌসুমি ও ছদ্মবেশী বেকারত্ব বিদ্যমান। শিল্পক্ষেত্রেও কর্মসংস্থান পর্যাপ্ত নয়। দেশে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান বাড়ানো সম্ভব হলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে শ্রমিক গোষ্ঠীর মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

৮. শ্রমের গতিশীলতা ও শ্রমবিভাগ: উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ানো হলে এবং উৎপাদনক্ষেত্রে

শ্রমিকদের যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ দেয়া সম্ভব হলে শ্রমবিভাগ বাস্তবায়ন হবে। এর ফলে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে শ্রমের গতিশীলতা বিদ্যমান থাকলে শ্রমের দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

৯. জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি: এদেশের শ্রমিকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতার কারণে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু এবং কর্মদক্ষতাও কম। দেশের জনগণের কর্মদক্ষতা বাড়াতে হলে তাদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়- প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

১০. পরিবেশ উন্নয়ন: দেশে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ, উপযুক্ত রাস্তাঘাট ও যোগাযোগব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশনের সুষ্ঠুব্যবস্থা প্রভৃতি গড়ে তুলে পরিবেশব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমেও জনসম্পদের উন্নয়ন করা সম্ভব।

১১. বাসস্থান সমস্যা দূরীকরণ: উপযুক্ত বাসস্থান মানুষের নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করে এবং নীরোগ ও চিন্তামুক্ত রেখে সুখী করে। তাই বাংলাদেশের জনগণের গুণগত মানোন্নয়নের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১২. পরিকল্পনা: বাংলাদেশের জনগণের কর্মদক্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে জনসম্পদ উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন।

১৩. কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি: কাজের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানো প্রয়োজন। এ কাজটি সম্পাদনের প্রধান দায়িত্ব উদ্যোক্তা বা মালিক পক্ষের। উপযুক্ত আর্থিক সম্মানি, স্বীকৃতি, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম বেতন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান-এসব বিষয় শ্রমিকের কর্মস্পৃহাকে প্রভাবিত করে। বিষয়টি শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়- প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

১৪. নারী ও শিশু উন্নয়ন: মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমেও মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

১৫. সমাজকল্যাণ কার্যক্রম: দেশের ভূমিহীন, দুস্থ, ভবঘুরে, এতিম, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচন মানবসম্পদ উন্নয়নের স্বার্থে খুবই প্রয়োজন।

১৬. যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন: যেকোনো দেশের যুবকরা দেশের সর্বাধিক সম্ভাবনাময় শ্রমশক্তি। তাই যুব সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করে, দেশের বেকার যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ঋণসহায়তা প্রদান, যুব অনুদান ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সম্ভব। ওপরে উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গুণগতমান বৃদ্ধি করা তথা মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির গুরুত্ব

মানবসম্পদ হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি। বিশ্বায়নের এ যুগে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উৎকর্ষ সাধনে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এমডিজি) মানবকল্যাণ এবং দারিদ্র্যবিমোচনকে বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেয়া হয়েছে। এ এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার আর্থ-সামাজিক খাতে শতকরা ২০ ভাগের অধিক হারে অর্থ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু; সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করছে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির গুরুত্ব

বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির গুরুত্ব: বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির গুরুত্ব বহুমাত্রিক। নিম্নে সংক্ষেপে বিষয়টি আলোচনা করা হলো:

(i) শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রসার: উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার প্রতিপালনে 'সকলের জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার একটি নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ii) মহিলা শিক্ষকের হার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১ শতাংশ হতে বর্তমানে ৬৪.৯৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।"

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির গুরুত্ব

(iii) তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার: শিক্ষা, গবেষণা, চিকিৎসা ও অফিস আদালতে বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কারণে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আরও প্রসারিত করা হয়েছে।

(iv) জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ: শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশই সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকার পরেই বাংলাদেশের স্থান।

(v) স্বাস্থ্য, পুষ্টি' ও জনসংখ্যা খাত: সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় দেশের স্বাস্থ্যখাতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যেমন-

(ক) প্রজননহার ও মৃত্যুহার কমেছে।

(খ) গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃমৃত্যুহার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

(গ) মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা, 'মিনি ল্যাপটপই ডিজিটাল ডাক্তার', টেলিমেডিসিন প্রভৃতি সুবিধা পাচ্ছে বর্তমানে এদেশের দরিদ্র জনগণ।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির গুরুত্ব

(vi) নারী উন্নয়ন: নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১' অনুমোদিত হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

(vii) শিশু স্বার্থ: আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নে শিশু স্বার্থ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সরকার শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে 'জাতীয় শিশু নীতিমালা-২০১১' অনুমোদন করেছে।

(viii) সামাজিক খাতের উন্নয়ন: সামাজিক খাত দেশের জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থাৎ উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অধিকতর মূল্য সংযোজনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি আরো বিস্তৃত করেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৪ : জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

টপিক – ০৮ আত্মকর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থান

আত্মকর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

আত্মকর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থান

স্ব বা আত্ম-কর্মসংস্থান (Self employment) বলতে বোঝায় স্বাধীনভাবে একজন কর্মক্ষম ও কর্মে ইচ্ছুক মানুষ বেকারত্বের অভিশাপ হতে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে স্ব-উদ্যোগে উৎপাদন বা আয় অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নিজের বা ঋণের মাধ্যমে স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার আলোকে সীমিত ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

কারণ: বাংলাদেশ অতিরিক্ত জনসংখ্যা সমস্যায় জর্জরিত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। সীমিত আয়তনের এ ভূখণ্ডে বর্তমানে লোকসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। এদেশে প্রায় ৬.৩৫ কোটি কর্মক্ষম লোকের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ২৬ লক্ষ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর এদেশের শ্রমবাজারে প্রায় ১৩.৪ লক্ষ নতুন লোক প্রবেশ করছে। এছাড়াও আমাদের অর্থনীতিতে রয়েছে ছদ্মবেশী ও মৌসুমি বেকারত্ব। দক্ষ জনশক্তির অভাব, মূলধনের দুষ্প্রাপ্যতা, বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র সংকট, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি কারণে দেশে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং জাতি হিসেবে আমাদেরকে টিকে থাকতে হলে এদেশের কর্মক্ষম যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। 'শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭' অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট কর্মে নিয়োজিতদের মধ্যে প্রধান অংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, যাঁ প্রায় ৪৪.৩ শতাংশ।

আত্মকর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থান

ক্ষেত্র: আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে একজন মানুষ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কুটিরশিল্পে স্বল্প মূলধন, সহজলভ্য কাঁচামাল, সাধারণ যন্ত্রপাতি দ্বারা স্বউদ্যোগে গৃহে পারিবারিক পরিবেশে উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়। তাই আমাদের দেশের বেশিরভাগ কুটিরশিল্পই আত্মকর্মসংস্থানমূলক। যেমন-তাঁতশিল্প, চরকাশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প, রেশমশিল্প, মৃৎশিল্প, কাঁসা ও পিতলশিল্প, কাঠশিল্প, বিড়িশিল্প, শঙ্খশিল্প, ঝিনুকশিল্প, ছোবড়াশিল্প, লবণশিল্প, অলঙ্কারশিল্প, জুতা-চপ্পল, মানিব্যাগ তৈরিশিল্প, পুতুল তৈরি, ফুলের টব তৈরি, উলের কাজ প্রভৃতি কুটিরশিল্পের কাজ আত্মকর্মসংস্থানমূলক এবং এসব ক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে।

রাষ্ট্র বা সরকারের ভূমিকা: বাংলাদেশের মতো দেশসমূহে দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বৃদ্ধিসহ মানব উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যাতে দারিদ্র্য লাঘব হয় এবং টেকসই (Sustainable) উন্নয়ন হয়, সেজন্য তাদের উৎপাদন-স্বত্ব (Entitlement) বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্ষমতায়ন ও সচেতনতায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। একই সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মাথাপিছু আয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ আবশ্যক যা তাদেরকে উন্নত জীবনে উৎসাহিত করবে।

আত্মকর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থান

উপসংহারে বলা যায়, বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে এবং দারিদ্র্যবিমোচন ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষত পল্লি অঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মকর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থান

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য করণীয়

(i) আত্ম-কর্মসংস্থান বা স্ব-কর্মে নিয়োজিত হতে হলে প্রথমে প্রয়োজন জ্ঞান-অর্জন বা উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ। মানবসম্পদের বিকাশে শিক্ষা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পাঠ্যসূচিতে ধাপে ধাপে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক। উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া একজন ব্যক্তির বোধশক্তি, অনুধাবন ক্ষমতা, বিচার-বুদ্ধির মূল্যায়ন, প্রয়োজনের তীব্রতা যাচাই, দক্ষতা ও নির্বাচন কোনোটিই সম্ভব নয়।

(ii) নিজস্ব বিচার-বুদ্ধির মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন। কোন প্রকল্পটি সে গ্রহণ করবে, কেন গ্রহণ করবে, এটি কেমন লাভজনক, কোনো ঝুঁকি আছে কী-না? প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর একজন সফল আত্মকর্মীর খোঁজা উচিত এবং প্রয়োজন।

(iii) তৃতীয়ত প্রয়োজন মূলধন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কী পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, মূলধনের উৎস কী হবে? কীভাবে ব্যবহার করলে মূলধনের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত হবে তা বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকা আবশ্যক।

(iv) উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা-বাজার কীরূপ? কত সহজে বাজারজাতকরণ করা সম্ভব? কীভাবে উৎপাদিত পণ্যের বাজারের আরও প্রসার ঘটানো যায়? প্রতিযোগী উদ্যোক্তা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখা আবশ্যক।

আত্মকর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থান

(v) উৎপাদিত পণ্যের বৈচিত্র্য আনায়ন (diversification) করা জরুরি। প্রতিষ্ঠানটি টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতি মুহূর্তে উদ্যোক্তাকে পণ্যের বৈচিত্র্যকরণে মনোযোগী হতে হবে।

একজন আত্মকর্মীকে ভাবতে হবে, 'আমি একজন সফল উদ্যোক্তা হতে চাই। আমি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে চাই। নিজের সামর্থ্যের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়ন করতে চাই।' এভাবে একজন আত্মকর্মী সফল হতে পারে।

একজন আত্মকর্মী সফলতা লাভের জন্য ১০টি গুণাবলিকে ধারণ করা আবশ্যক। যথা- (i) দূরদৃষ্টি, (ii) আত্মবিশ্বাস, (iii) সঠিক কর্মপরিকল্পনা, (iv) ইতিবাচক মনোভাব, (v) আত্মনিবেদন, (vi) নিজের ভালো লাগা, (vii) কঠোর অধ্যবসায়-অনুশীলন, (viii) লেগে থাকা, (ix) ধৈর্য এবং (x) প্রয়োজনে সঠিক সাহায্য খুঁজে নেওয়া।কশ্রেণ

আত্মকর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থান

একজন সফল আত্মকর্মীর ঘটনা

বেকার, কর্মঠ যুবকেরা স্বউদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে ফুল, ফল, শাকসবজি চাষ, মাছের খামার প্রতিষ্ঠা; গরু-মহিষ-ছাগল-ভেড়া এবং হাঁস-মুরগি-কবুতর ও কোয়েল পালনের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত বেশির ভাগ ফল গাছই দেশের সর্বত্র কম-বেশি হয়ে থাকে। তবে আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান যেমন তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আলো, বাতাসের আর্দ্রতা, বাতাসের গতিবেগ এবং মাটির গুণাবলি ফল গাছের ফল ধারণ, বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়কে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য, পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়াদির ওপর ভিত্তি করে প্রধান প্রধান ফলের চাষ বিশেষ বিশেষ এলাকায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যেমন-মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, বগুড়া, রংপুর, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, রাঙামাটি, বান্দরবান ও ময়মনসিংহে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কলা চাষ করা হয়।

আত্মকর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থান

রংপুর-এর সফিক মিয়া দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিল বিধায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডির পর আর পড়ালেখা হয়নি। কাজের সুবাদে রংপুর শহরে পরিচয় হয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জনাব নজরুল ইসলাম-এর সাথে। উক্ত কর্মকর্তার উৎসাহ, পৃষ্ঠপোষকতায় সফিক তার এলাকায় প্রায় ৪ একর জমি নিয়ে উন্নতমানের কলা চাষ শুরু করেন। সে জানতে পেরেছে, আহারোপযোগী কাঁচা এবং পাকা কলায় আমিষ, শর্করা, চর্বি, খনিজ লবণ, ক্যালসিয়াম, লৌহ উপাদান, ভিটামিন সি এবং পর্যাপ্ত খাদ্য শক্তি রয়েছে-যা মানবদেহের জন্য খুব উপকারী। এছাড়া, ধান, পাট ও আখসহ প্রচলিত অন্যান্য ফসলের তুলনায় কলা চাষে শ্রম ব্যয় কম হয়, বিক্রি করতেও ঝামেলা নেই। সর্বোপরি একবার কলার চারা রোপণ করলে ২/৩ মৌসুম চলে যায়। বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত না হলে এক একর জমি হতে ধান পাওয়া সম্ভব (ইরি-আমনসহ) ৮০ থেকে ৯০ মণ, এর আনুমানিক বাজারদর ৪৫-৫০ হাজার টাকা।

আত্মকর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থান

এতে উৎপাদন খরচ হবে সর্বসাকুল্যে প্রায় ১৬ হাজার টাকা। অথচ এক একর জমির কলা বিক্রি হবে প্রায় দুই লাখ টাকা পর্যন্ত। এতে সর্বোচ্চ উৎপাদন খরচ হবে ৫০ হাজার টাকা। সফিক মিয়ার দিন বদল হয়েছে। সে এখন ঢাকার গাবতলীতে বড় সবজি বিক্রেতা। তার প্রতিষ্ঠানে এখন ২০ জন যুবক চাকরি করে। তার দিন বদলের কথা পত্রিকার পাতায় ছাপানোর পর এখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যুবকেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্ট্রবেরি, আম, আনারস, শরিফা (Custard apple or Sugar apple), বাউকুল, আঙ্গুর, পেয়ারা, কাঁঠাল, নাশপাতি, ঢেঁড়শ, ব্রোকলি (সবুজ ফুলকপি), গাজর এবং করলা ও উচ্ছে চাষসহ বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি চাষ, মৎস্য চাষ, পশু-পাখি পালন বাণিজ্যিকভাবে শুরু করেছে। তাই সফিক মিয়া বাংলাদেশের বেকার যুবকদের নিকট স্ব-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নতুন এক প্রেরণার নাম।

আত্মকর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থান

কেইস সমীক্ষণ (Case Study)

প্রথমে আত্মকর্মসংস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ, একজন সফল আত্মকর্মীকে চিহ্নিত করা, তার সাথে কথা বলে কর্মপরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রয়োজন। সাক্ষাৎকারটি আলোচনা বা লিখিত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমেও সম্ভব।

আত্মকর্মসংস্থান সম্পর্কিত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন হতে তথ্য সংগ্রহ

প্রতিবেদন অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাছাই করা

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সমন্বয় করা

সমন্বিত তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য করণীয়সমূহ চিহ্নিতকরণ

ধরন অনুযায়ী করণীয়সমূহের তালিকা উপস্থাপন

পুনঃবিশ্লেষণ করা

করণীয়সমূহের তালিকাসহ গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা

গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন

সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছে প্রতিবেদন জমা দান

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সুবিধামতো সময়ে আত্মকর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনা

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৪ : জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

টপিক – ০৯ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিবাচক প্রভাব কোনটি? [আলিম '২৩]
(ক) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি (খ) খাদ্য ঘাটতি বৃদ্ধি
(গ) শ্রমের যোগান বৃদ্ধি (ঘ) বেকারত্ব বৃদ্ধি

২. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে যে সময়ে খাদ্য উৎপাদন ৫ গুণ বৃদ্ধি পায় সে সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে- [ঢা. বো. '২৩]
(ক) ৪ গুণ (খ) ৫ গুণ (গ) ৮ গুণ (ঘ) ১৬ গুণ

৩. জনসংখ্যার নির্ধারক কোনটি? [কু. বো. '২৩]
(ক) মুদ্রাস্ফীতি (খ) উৎপাদন (গ) নিট অভিবাসন (ঘ) মূলধন গঠন

৪. নিচের কোনটি জনসংখ্যার আকারকে সরাসরি বৃদ্ধি করে?
(ক) মাতৃমৃত্যুহার (খ) অভিবাসন (গ) শিক্ষার হার (ঘ) উচ্চ জন্মহার

১৬. চিত্তবিনোদন ও উন্নত শিক্ষার কারণে জন্মহার- [দি. বো. '২৩]
(ক) হ্রাস পায় (খ) বৃদ্ধি পায় (গ) স্থির থাকে (ঘ) দ্বিগুণ হয়

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তিতে কোনটি অধিকতর সহায়ক? [ব. বো. '২৩]
(ক) আত্মকর্মসংস্থান (খ) সু-স্বাস্থ্য (গ) চাকরি খোঁজা (ঘ) মেধা

৭. নিচের কোনটি দ্বারা জন্মহার পরিমাপ করা হয়? [ব. বো. '২৩]
(ক) CBR (খ) CDR (গ) CRR (ঘ) CRB

৮. কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব হচ্ছে-
(ক) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি (খ) জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি
(গ) কৃষি জমির ওপর চাপ বৃদ্ধি (ঘ) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি

৯. জনাব শাহেদ পড়ালেখা শেষ করে চাকরি না খুঁজে একটি গরুর খামার প্রতিষ্ঠা করেন। বলে? জনাব শাহেদের এই প্রচেষ্টাকে কী? [চ. বো. '২৩]
(ক) বিনিয়োগ বৃদ্ধি (খ) দক্ষতা বৃদ্ধি (গ) আত্মকর্মসংস্থান (ঘ) সৃজনশীলতা

১০. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কোনটি? [চ. বো. '২৩]
(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন (খ) উচ্চ জন্মহার
(গ) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (ঘ) শিক্ষার প্রসার

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১. বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি কোনটিকে প্রভাবিত করে? [সি. বো. '২৩]
(ক) নগরায়ন (খ) স্থানীয় সরকার (গ) জনসংখ্যা (ঘ) অবকাঠামো

১২. জন্ম গ্রহণ ছাড়াও দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ-[য. বো. '২৩]
(ক) অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর (খ) বহিরাগমন (গ) বহির্গমন (ঘ) মৃত্যু

১৩. বাংলাদেশে সর্বশেষ আদমশুমারি কত সালে পরিচালিত হয়?
(ক) ১৯৯১ (খ) ২০০১ (গ) ২০১১ (ঘ) ২০২১

১৪. মনে করি ২০২২ সালে বাংলাদেশে ২০ লক্ষ জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে। উক্ত বছরের মধ্যসময়ে মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি হলে CBR কত? [য. বো. '২৩]
(ক) ১২.৫ (খ) ১১.৫ (গ) ১৪.৫ (ঘ) ১৮.৫

১৫. জনসংখ্যা পরিমাপে ব্যবহৃত পদ্ধতি-
(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৪ : জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

টপিক – ১০ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

জনাব মাহবুব স্যার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, জনসংখ্যা সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে। তার মধ্যে একটি তত্ত্বে বলা হয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১, ২, ৪, ৮, ১৬... হারে এবং খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় ১, ২, ৩, ৪, ৫... হারে। অপর তত্ত্বে দেশে জনসংখ্যার এমন একটি স্তর নির্দেশ করা হয়, যেখানে সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় অর্জিত হয়।[ঢা. বো. '২২]

ক. নিট অভিবাসন কী?

খ. প্রশিক্ষণ কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়ন করে?

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রথমে জনসংখ্যার যে তত্ত্বটি উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনসংখ্যার তত্ত্ব দুটির মধ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোন তত্ত্বটিকে তুমি অধিকতর কার্যকর বলে মনে করো? বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

কোনো একটি উন্নয়নশীল দেশের ২৫ বছর অন্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো :

বছর	০	২৫	৫০	৭৫	১০০
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১	২	৪	৮	১৬
খাদ্য উৎপাদন	১	২	৩	৪	৫

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন কী?

খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে-ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকটি জনসংখ্যার কোন তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ-ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের সারণিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীকরণের উপায় ব্যাখ্যা

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

নিম্নে একটি দেশের খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি তালিকা দেয়া হলো :

বছর→	০	২৫	৫০	৭৫	১০০	.....	১৫০
জনসংখ্যা বৃদ্ধি→	১	২	৪	৮	১৬	.....	৬৪
খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি→	১	২	৩	৪	৫	.....	৭

ক. স্কুল মৃত্যুহার কী?

খ. আত্মকর্মসংস্থান দারিদ্র্যদূরীকরণে সহায়ক-ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যটি জনসংখ্যার যে তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উন্নত শিক্ষার প্রসার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ নিশ্চিত হলে উদ্দীপকে তত্ত্বটি কি কার্যকরী হবে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU